পথচলার ৫০
১৯৭২-২০২২

Mujib's

পঞ্চাশ পেরিয়ে পর্যটন

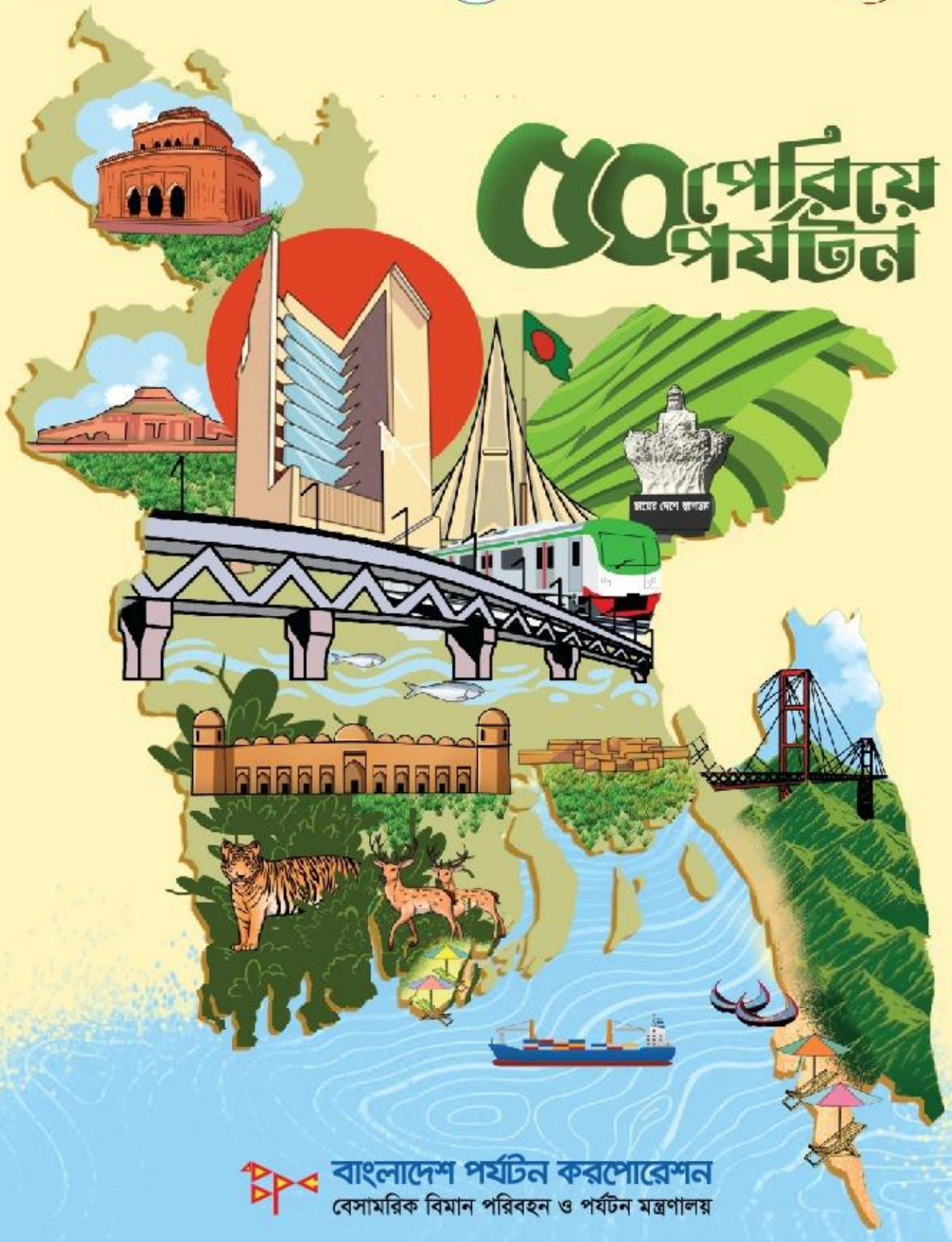

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

১৭ পৌষ ১৪২৯
১ জানুয়ারি ২০২৩

বাণী

দেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমি এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে পর্যটনশিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি দেশের জনগণের মাঝে পর্যটন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ভ্রমণে উৎসাহিত করার পাশাপাশি পর্যটনস্পট ও কেন্দ্রগুলোর সেবা ও মানোন্নয়নে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমণ করছেন। বাংলাদেশের হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি দেখার জন্য অনাদিকাল থেকে বিশ্বের বিখ্যাত পরিব্রাজকগণ এদেশ ভ্রমণ করেছেন। কালের বিবর্তনে পর্যটকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্ভার এবং রূপবৈচিত্র্যে ভরপুর বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

আমি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ পৌষ ১৪২৯
৩১ ডিসেম্বর ২০২২

বাণী

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ‘পথচলার ৫০’ শিরোনামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সংস্থার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বাংলাদেশের পর্যটন-শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পর্যটনশিল্প বিশ্বে একটি অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ও শ্রমঘন খাত। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য পর্যটন একটি কার্যকর উন্নয়ন কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশ্বব্যাপী করোনা অতিমারির কারণে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে পর্যটনশিল্প ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে করোনা অতিমারির সংকট কাটিয়ে পর্যটনশিল্পে নতুন উদ্যোগ ও ভাবনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ।

বাংলাদেশ বিপুল পর্যটনসম্ভাবনাময় একটি দেশ। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ইতিহাস, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি আমাদের দেশকে পরিণত করেছে একটি বহুমাত্রিক আকর্ষণসমৃদ্ধ অনন্য পর্যটন গন্তব্যে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন, পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রামের অকৃত্রিম সৌন্দর্য, সিলেটের সবুজ অরণ্যসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ এবং অতিথিপরায়ণ মানুষ শুধু দেশীয় নয় বিদেশি পর্যটক ও দর্শনার্থীদের কাছেও সমান জনপ্রিয় এবং সমাদৃত। পর্যটকদের সুবিধার্থে আওয়ামী লীগ সরকার ট্যুরিস্ট পুলিশ গঠন করে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান স্বাধীনতার পর পর্যটন-শিল্পের উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, পর্যটনশিল্পের পরিকল্পিত বিকাশের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পে তরুণদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। শহর থেকে গ্রামপর্যায়ে সকল শ্রেণি ও বয়সের পর্যটকদের বিনোদনের জন্য নানা প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের পর্যটনশিল্প আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এ দেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে আরও জোরালো ভূমিকা রাখবে মর্মে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আওয়ামী লীগ সরকার দেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন পর্যটন সুবিধা সৃষ্টিতে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। স্থানীয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে পর্যটনের উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আসুন, সম্মিলিতভাবে পর্যটনের উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করে বিশ্বদরবারে দেশের পর্যটনশিল্পকে কার্যকরভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মোঃ মাহবুব আলী
প্রতিমন্ত্রী
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ পৌষ ১৪২৯
১ জানুয়ারি ২০২৩

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিধন্য প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন গৌরবময় পথচলার ৫০ বছর উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রতিষ্ঠানটির সুবর্ণজয়ন্তীতে আমি এর সকল গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের মধ্যে যে প্রভূত উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায় তার স্বপ্নদ্রষ্টা বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতার হাত ধরেই বাংলাদেশে পর্যটনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। দেশের প্রকৃতি ও মনুষ্যসৃষ্ট সকল নান্দনিক সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যকে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে ১৯৭২ সালেই 'প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার-১৪৩'-এর বলে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন', যা এ দেশের পর্যটনশিল্প বিকাশের পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্নে মাত্র ৭টি বাণিজ্যিক ইউনিট নিয়ে যাত্রা শুরু করা বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বর্তমান ইউনিট সংখ্যা ৫০টি। আরো বেশ কয়েকটি ইউনিট চালু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। পেরিয়ে আসা দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের আকর্ষণীয় পর্যটন এলাকাসমূহে হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, ডিউটি ফ্রি অপারেশনস, রিসোর্ট, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করে পর্যটকদের মানসম্মত খাবার, আবাসন এবং পর্যটন খাতে দক্ষ জনবল তৈরির মাধ্যমে নানাবিধ পর্যটন-সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের প্রধান পর্যটনকেন্দ্র কক্সবাজারসহ দেশের অন্যান্য পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকাসমূহকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতেও বিগত বছরগুলোতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে পর্যটন করপোরেশন।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পর্যটনের উন্নয়নে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পর্যটনবান্ধব নীতিমালা ও কার্যক্রমের ফলে দেশের পর্যটনশিল্প এখন বিকাশের নতুন অধ্যায়ে উপনীত। দেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পরিচালন ও সেবা আধুনিকায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ১২ বছরে প্রায় ২৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে পর্যটন করপোরেশন। এ ছাড়াও দেশের পর্যটন-শিল্পের উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ৩৩৫ কোটি টাকার ১২টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশে পর্যটনশিল্পের প্রসারের কারণে এ খাতে দক্ষ জনশক্তির ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সদয় নির্দেশনায় বঙ্গবন্ধুর হাতে ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ সময় ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ীভাবে কার্যক্রম চালিয়ে আসা সংস্থাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বদান্যতায় রাজধানী ঢাকার আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় খুঁজে পেয়েছে তার কাঙ্ক্ষিত স্থায়ী ঠিকানা 'পর্যটন ভবন'।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের পর্যটনশিল্পের পথিকৃত প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এর অর্ধ-শতাব্দির অভিজ্ঞতা এবং সময়োপযোগী কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে দেশের পর্যটনশিল্পকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে আগামীতেও নেতৃত্বের জায়গায় থেকে কাজ করবে মর্মে আমার বিশ্বাস।

আমি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ মাহবুব আলী, এমপি

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন
সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ পৌষ ১৪২৯
১ জানুয়ারি ২০২৩

বাণী

১৯৭২ সালের ২৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৩ এর মাধ্যমে বাঙালি জাতির পিতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের (বাপক) পথ চলা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানটি তার ৫০তম বছরে পদার্পণ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের সার্বিক জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। পর্যটন একটি সেবামূলক শিল্প। জনগণকে সেই মানসম্মত সেবা দেওয়ার মানসেই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সারাদেশে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করে পর্যটকদের সুবিধাদি প্রদান করে আসছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বাংলাদেশে টেকসই পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১০ সালে একটি যুগোপযোগী 'পর্যটন উন্নয়ন নীতিমালা' প্রণয়ন করেছে। এ ছাড়া একই বছর 'বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল অধ্যাদেশ ২০১০' ও 'বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০' প্রণয়ন করেছে। দেশের পর্যটন খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে পর্যটন মহাপরিকল্পনার কাজও এগিয়ে চলছে। ফলে দেশের পর্যটনশিল্পের বিকাশ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে। বর্তমান সরকার গত এক যুগ ধরে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৫টি পর্যটন সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিনাজপুর, কুয়াকাটা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর, রাঙ্গামাটি, সিলেটের জাফলং ও লালাখাল এবং সুনামগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জের কাজীপুর, ঢাকার অদূরে গাজীপুরস্থ সালনায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পর্যটনশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডি-জি) অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য সচেষ্ট আছে। এ উদ্দেশ্যে বাপক-এর অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন ইতোঃপূর্বে শুরু হয়ে এখনও চলমান রয়েছে। যেমন : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত পারকীতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা শেখ হাসিনা সেতু সংলগ্ন এলাকায় মোটেল, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, আম্রপল্লী স্থাপন, কক্সবাজার খুরুশকুলে শেখ হাসিনা টাওয়ারসহ পর্যটন জোন স্থাপন; দেশের অভ্যন্তরে পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকায় ট্যুর পরিচালনার লক্ষ্যে ৬টি ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহসহ বিভিন্ন সুবিধাদি প্রর্বতনের কাজ চলমান রয়েছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, যুবসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পর্যটনে সম্পৃক্ত-করণ, গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি ব্যাপক দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশি-বিদেশি পর্যটকদের পর্যটন সম্পর্কিত নানা প্রকার তথ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে। দেশের পর্যটন খাতের সকল তথ্যাদি জনগণকে সরবরাহ করতে বাপক ব্রোশিওর-লিফলেট মুদ্রণ ও বিভিন্ন মেলা, সেমিনার, বিদেশি দূতাবাসগুলোতে প্রচার করে আসছে। দেশের সব কয়টি বিভাগের 'পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানসমূহ' নিয়ে বিভাগভিত্তিক চিত্র ও তথ্য সম্বলিত ৮টি বিভাগের বই প্রকাশের কার্যক্রমও সম্পন্ন করেছে। একই সাথে সরকারঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ স্লোগানকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন তার সকল বাণিজ্যিক স্থাপনাসমূহ অনলাইন অটোমেশন পদ্ধতির আওতায় এনেছে। ফলে জনসেবা প্রদান অধিক দ্রুত ও সহজসাধ্য হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, আত্মমর্যাদাশীল স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান, সহযোগিতা ও নির্দেশনার মাধ্যমে বাংলাদেশের গর্বিত এই পর্যটন প্রতিষ্ঠানটি পর্যটন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার প্রসারণ, পর্যটন সংক্রান্ত কর্মসংস্থান সৃজন, পর্যটন প্রশিক্ষণ প্রদানসহ তার গৌরবজনক ভূমিকা অব্যাহত রাখার মধ্যদিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়নে অন্যতম বাতিঘর হবে।

পরিশেষে আমি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

মোঃ আলি কদর
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

১৭ পৌষ ১৪২৯
১ জানুয়ারি ২০২৩

বাণী

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই বাংলাদেশে যে কয়টি প্রতিষ্ঠান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ হাতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মধ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) অন্যতম। জাতির পিতার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

সরকারি বরাদ্দ এবং নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের জনপ্রিয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করেছে। জন্মলগ্নে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের স্থাপনা ছিল মাত্র সাতটি। সৈকত শহর কক্সবাজারের মোটেল উপল ও মোটেল প্রবাল, কাপ্তাই প্রজেক্টের অধীনে নির্মিত রাঙামাটির হলিডে কমপ্লেক্স, খুলনা শহরের হোটেল সেলিম, ঢাকা প্রজেক্টের আওতায় প্রধান কার্যালয়ের রেন্ট-এ-কার ও সাকুরা বার এবং ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরস। পরবর্তীতে বিগত ৪৮ বছরে সরকারি অনুদানে একের পর এক স্থাপনা নির্মাণের পর বর্তমানে করপোরেশনের ইউনিট সংখ্যা ৫০টি। আরো বেশ কয়েকটি ইউনিট চালু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। গত ৫০ বছরের পথচলার দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের আকর্ষণীয় পর্যটন এলাকাসমূহে হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, ডিউটি ফ্রি অপারেশনস, বার, রিসোর্ট, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করে পর্যটকদের মানসম্মত আহার, আবাসন এবং নানাবিধ পর্যটন-সেবা প্রদান করে এসেছে।

দেশের প্রধান পর্যটনকেন্দ্র কক্সবাজারে পর্যটকদের জন্য যখন মানসম্মত আহার, আবাসন ও অন্য বিনোদনের তেমন কোন ব্যবস্থাই ছিল না, তখন পর্যটন করপোরেশন সেখানে হোটেল-মোটেল স্থাপন করে পর্যটনের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। পরবর্তীতে একইভাবে সাগরকন্যা কুয়াকাটাকে একটি জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে এ সংস্থা পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে, গড়ে তোলে কুয়াকাটার বাণিজ্যিক ইউনিটটি। এভাবেই সিলেট শহরসহ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের জাফলং, মাধবকুণ্ডে গড়ে তোলে নতুন নতুন স্থাপনা। একই ধারায় বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি টুঙ্গিপাড়া, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিধন্য যশোরের সাগরদাড়ি, বেনাপোল, উত্তরবঙ্গের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মহাস্থানগড়, কান্তজীউ মন্দির, তাজহাট জমিদার বাড়ির মতো দেশের প্রধান প্রধান আকর্ষণীয় এলাকাসমূহকে পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন।

পর্যটনশিল্প-সংশ্লিষ্টদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পরিচালিত দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে, বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও)-এর সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিবছর প্রায় ১ হাজার ৬শ জন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করছে প্রতিষ্ঠানটি। এ পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজারের অধিক দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করেছে এনএইচটিটিআই, যারা দেশ-বিদেশে সুনামের সাথে কাজ করে চলেছে। পর্যটনশিল্পে কাজ করার মাধ্যমে তারা এ শিল্পের বিকাশ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র বিমোচনসহ দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে, রাখছে এবং আগামীতে বৃহত্তর কলেবরে রাখবে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত অনেকেই জীবনে লাভ করেছেন আশাতীত সাফল্য।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন আয়োজন করতে পেরে আমি ধন্য। বাপক-এর পঞ্চাশ বছরের পূর্তি উদযাপনে এবং এই স্মরণিকা প্রকাশ করতে যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

মোঃ আলি কদর

পথচলার ৫০
১৯৭২-২০২২
Mujib's
৫০ পেরিয়ে পর্যটন
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

মার্চ ২০২৩

প্রকাশনা স্বত্ব

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

উপদেষ্টা

মোঃ আলি কদর

চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

সম্পাদনা পরিষদ

১. একেএম তারেক, পরিচালক (প্রশাসন), বাপক;

২. মোহাম্মদ শওকত ওসমান, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাপক;

৩. মোহাম্মদ সফিউজ্জামান ভুইয়া, মহাব্যবস্থাপক (ডিএফও), বাপক;

৪. শাহ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক), বাপক;

৫. মোঃ জিয়াউল হক হাওলাদার, ব্যবস্থাপক (জনসংযোগ), বাপক;

৬. মোবাশ্বেরা আক্তার, উপব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাপক;

৭. মোহাম্মদ শেখ মেহদি হাসান, উপব্যবস্থাপক (বিপণন), বাপক।

প্রচ্ছদ

আব্দুল্লাহ আল মারুফ

ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট, দেহ কমিউনিকেশন

অলঙ্করণ

গ্রাফিক্স টিম

দেহ কমিউনিকেশন

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা

সম্পাদনা পরিষদ

পঞ্চাশ পেরিয়ে পর্যটন

ছবি

সকৃতজ্ঞ সংগ্রহ

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	'মুজিবের বাংলাদেশ' বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়তে বিপিসি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ	১৪
০২	Blue Economy and Tourism in Bangladesh	১৬
০৩	Sustainable Tourism	২০
০৪	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ	২২
০৫	Protecting River and Water bodies for Tourism Development	২৬
০৬	পর্যটনশিল্পে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নে পর্যটন করপোরেশনের ভূমিকা	২৯
০৭	বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের বিকাশ	৩১
০৮	শঙ্খ নদে, রেমাক্রি ঝরনায়	৩৫
০৯	পর্যটনবিষয়ক গবেষণা: মিথ যেভাবে পর্যটনকে সমৃদ্ধ করে	৩৮
১০	স্মার্ট পর্যটন, স্মার্ট বাংলাদেশের অঙ্গীকার	৪১
১১	রাঙ্গামাটির বুকে	৪২
১২	বাংলাদেশকে দেখা	৪৩
১৩	পর্যটনক্ষেত্রে নারীর সুবিধা-অসুবিধা	৪৪
১৪	ভ্রমণ পিপাসুদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে মিরসরাইয়ের পর্যটনস্পটগুলো	৪৬
১৫	বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনা, সমস্যা ও সমাধানের উপায়	৫০
১৬	যেতে যেতে পথে...	৫৪
১৭	পর্যটন নগরী কক্সবাজারের ইতিহাস	৫৮
১৮	সৌন্দর্যের রানি চট্টগ্রাম হোক আগামীর মিনি সিঙ্গাপুর	৬০
১৯	বিউটিফুল বাংলাদেশ: আলো আঁধারে পর্যটনশিল্প ও তারুণ্যের তোলাপাঠ	৬২
২০	কোভিড-১৯ পরবর্তী পর্যটন ভাবনা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যটন	৬৫
২১	অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে পর্যটন খাত: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	৬৮
২২	সীমাবদ্ধতা দূরে ঠেলে পর্যটনে প্রসারিত হোক দেশের সীমা	৭১
২৩	পর্যটনশিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জোরালো ভূমিকা প্রয়োজন	৭৪
২৪	পর্যটনশিল্পে বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য	৭৮
২৫	গ্রাম পর্যটনের দিকে ঝুঁকছি না কেন	৮১
২৬	পর্যটনশিল্প বিকাশে গুরুত্ব দিন	৮৫

‘মুজিবের বাংলাদেশ’ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়তে বাপক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

Photo Credit: Bangladesh Television

এ মাটির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিদেশে পর্যটকদের নিকট তুলে ধরা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে এবং বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চলছে Mujib’s Bangladesh বা ‘মুজিবের বাংলাদেশ’ ব্র্যান্ডিং। বিশ্বে বাংলাদেশের ইতিবাচক ইমেজ ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন এক অগ্রনায়ক এবং দেশটির পর্যটনশিল্পের জন্মের পেছনে একক কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের শুধু এক মহাকাব্যিক মহানায়কই নন, আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাঁর রাজনৈতিক দর্শন এবং জীবন আজ কিংবদন্তীর মতো। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে তুলে ধরা, এর পর্যটনশিল্পের প্রচার ও বিপণনে বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশম্যাটিক ইমেজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিশিলা হিসেবে কাজ করছে।

বিখ্যাত নাট্যকার উইলিয়াম শেকস্‌পিয়রের জন্মস্থান দেখার জন্য অনেক পর্যটক ইংল্যান্ডের স্ট্রাটফোর্ড -আপন-অ্যাভন ভ্রমণ করেন, নেলসন ম্যান্ডেলার বাসভবনের স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলো দেখতে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণে যান।

এ মাটির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিদেশে পর্যটকদের নিকট তুলে ধরা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান, শৈশব, কৈশর, ছাত্রজীবন, রাজনৈতিক জীবন, কর্মজীবন, কারাগারের জীবন এবং তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের স্থান বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন আকর্ষণ।

বিশ্বব্যাপী এ বিষয়বস্তু ও স্থানগুলোকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা আমাদের দায়িত্ব। এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন একযোগে কাজ করছে। ইতোমধ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রকাশ করেছে 'মুজিবের বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি নান্দনিক স্মারকগ্রন্থ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা দিবসে স্মারক গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেছেন।

স্বাধীনতার মহানায়ক ও জাতির জনকের প্রতি যথাযথ সম্মান জানাতে এবং তাঁর জন্মভিটা ও সমাধিসৌধকে পর্যটন আকর্ষণে পরিণত করতে এবং সেখানে ভ্রমণে যাওয়া পর্যটকদের সেবা দিতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ২০০১ সালেই গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় হোটেল মধুমতী স্থাপন করে। এরপর ২০২২ সালে পদ্মাসেতু উদ্বোধনের অব্যবহিত পর জুলাই মাসে পর্যটন করপোরেশন পদ্মাসেতু, ভাঙ্গা চত্বর ও টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে সপ্তাহে দুই দিন প্যাকেজ ট্যুর চালু করে। এই ট্যুরটি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরপর হতে টুঙ্গিপাড়ায় ট্যুরের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

ইউনেস্কো ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে একটি 'ডকুমেন্টারি বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসাবে মনোনীত করেছে। তাঁর বীরত্বপূর্ণ এই বক্তৃতা আমাদের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণা। বিশ্বজুড়ে নিপীড়িত মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এ ভাষণ ব্যাপকভাবে দেশে ও বিদেশে প্রচারের কার্যক্রম চলছে।

দেশের উন্নয়নে আত্মনিবেদনে তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধু অনেকগুলো অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি কবি জীবনানন্দ দাশের মা কুসুমকুমারি দাশের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'মুখে হাসি, বুকে বল তেজে ভরা মন/ মানুষ হইতে হবে এই তার পণ।' আমাদের বর্তমান তরুণ প্রজন্মকেও সাহসের সাথে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দেশের পর্যটনশিল্পসহ সকল উন্নয়নে আত্মনিবেদন করতে হবে।

বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু একজন মহান আদর্শবান ব্যক্তিত্ব। দেশপ্রেমে অনন্য, মানবতাবাদী ও জনকল্যাণে এক মহান পুরুষ। যিনি বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের এবং নিজ পরিবারের সুখ-শান্তি ত্যাগ করে জেল খেটেছেন ৪ হাজার ৬৮২ দিন, অর্থাৎ ১২ বছরেরও বেশি। বিশ্বের কম নেতাই আছেন যে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এতদিন জেল খেটেছেন। বাঙালির জন্য তাঁর পরম মমতা, ভালোবাসা তাঁকে বাঙালি জাতির হৃদয়ে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তাই এ মহান ব্যক্তিত্বের আত্মত্যাগ এবং দর্শন আমাদের উর্ধ্বে তুলে ধরে সোনার বাংলা গড়ার জন্য আমাদের নিরলস পরিশ্রম করতে হবে।

পর্যটনশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

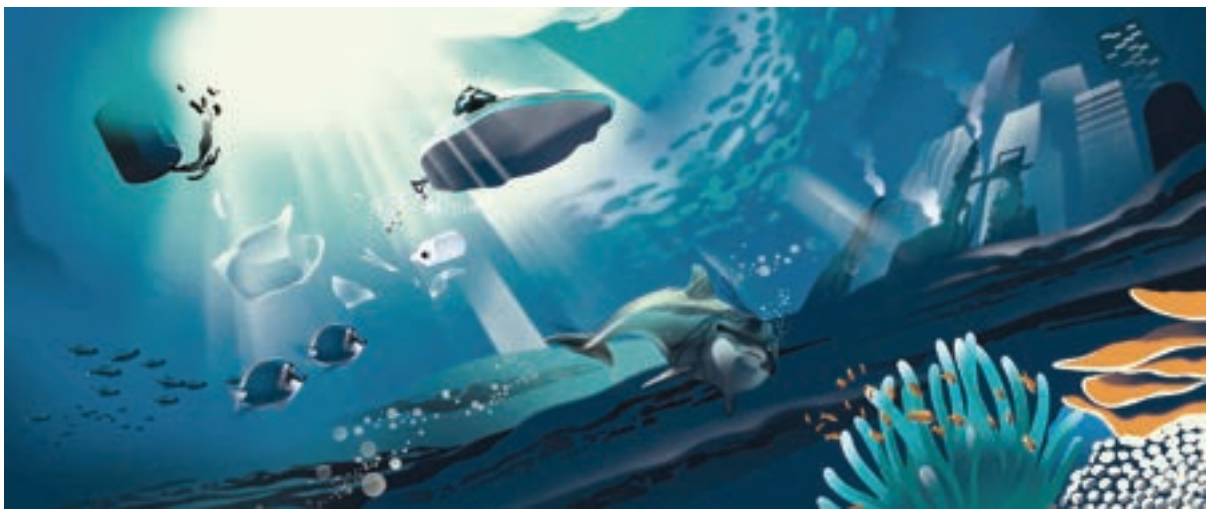

Photo Credit: deutsche-bank.es

BLUE ECONOMY & TOURISM IN BANGLADESH

We can say that proper planning and development of Blue Economy can ensure not only the economic growth, but also ecological balance and social sustainability.

Md. Abdus Samad
Chairman (Additional Secretary) SPARRSO

Over the last couple of years, Blue Economy takes an important place at the agenda of global economic development. On the other hand, efforts are on the way by many small and medium island countries to link it with environmental sustainability and well being of people. Blue Economy supports all the aspects UN sponsored SDG. However, SDG Goal-14 is directly involved for development of Blue Economy and marine tourism development.

We all know that Blue Economy is an economic system based on the conservation of environment and natural resources. It is expected with the process of development of Blue Economy -sustainability of resource availability, ecosystem balance and environmental health, and encourage the effective utilization and management of resources will be ensured.

The Blue Economy concept can be applied to support development of marine and coastal tourism. Tourism related to Blue economy is divided into marine and coastal tourism. Bangladesh has a very strategic position both geographical and climatic. Marine and coastal tourism are interconnected as per the fundamental principle of Blue Economy. Both of them are dependent on the sea and the marine environment. Marine tourism mostly takes place at sea, for example is a cruise and sailing. While coastal tourism takes place in coastal areas that include beach-based tours and recreational activities, such as swimming and sunbathing, coastal walks and resorts.

Marine tourism constitutes a form of tourism totally connected to and dependent on the sea and the marine environment. Marine tourism covers a wide range of activities taking place in the deep oceans, the most predominant of which are cruising and sailing. Other activities are scuba diving, underwater fishing, water skiing, windsurfing, tours to maritime parks, wildlife mammal watching, yachting etc. Marine tourism, while the vast majority of activities take place in the sea, their supporting facilities and infrastructure are usually found on land such as serving cruisers, yachts etc. Coastal tourism is also a form of tourism in which the water/sea element is predominant and is considered to be the main asset and advantage. Coastal tourism is very closely related to marine (maritime) tourism (since it covers activities taking place at the coastal waters too) although it also covers beach-based tourism and recreational activities, such as swimming and sunbathing, coastal walks, second homes, tourism resorts, boating, reef-walking, snorkeling, diving, fishing, dolphin show, water park, sea-life museum etc.

As regards coastal tourism, all relevant infrastructures and facilities (hotels, resorts, second homes, condos, etc.) are also found exclusively on land and usually much closer to the shoreline.

Tourism development is in general responsible for:

a) Land alteration (particularly in the coastal zone);

b) Increase of energy consumption, resulting in global warming, release of greenhouse gases, etc. (i.e. effects accelerating climate change);

c) Extinction of wildlife species and other important components of the natural ecosystem;

d) Augmentation of water consumption, especially in water-scarce regions.

Since the 1990s, the issue of sustainable development is defined as a development process that optimizes the benefits of natural resources, culture and human. Blue Economy can be a framework in sustainable development. Blue Economy is an economic development paradigm based on ecosystem principles. The Blue Economy conceptualizes oceans as "Development Spaces" where spatial planning integrates conservation, sustainable use, oil and mineral wealth extraction, bioprospecting, sustainable energy production and marine transport.

The Blue Economic Concept provides an opportunity to develop more economically and environmentally sound investments and businesses, utilize natural resources more efficiently and less environmentally, produces more efficient and cleaner systems, produces greater products and economic value, increase labor absorption, and provide an opportunity to benefit each contributors more fairly. The Blue Economic Concept was developed to answer the challenge that the world economic system tend to be exploitative and environmentally destructive.

The essence of the Blue Economy concept is:

a. Learn from the Nature: Imitate the workings of nature (ecosystem), work in accordance with what is provided by nature efficiently and not reduce but instead enrich nature.

b. Follow the logic of Ecosystem: The workings of the ecosystem are modeled on the Blue Economy, as water flows from the mountains carrying nutrients and energy to meet the basic needs of the lives of all living things and plants, waste from one to food / energy source to another, so that the ecosystem's life system becomes balanced. Only by gravity energy is distributed efficiently and evenly without external energy extraction. To support the living system, sunlight becomes

support the living system, sunlight becomes the energy of photosynthesis of all the contributors who need it.

c. Inspired by 100 innovations: Empirically 100 practical economic innovations have been developed and prove that ecosystems are always working toward higher efficiency levels to drain nutrients and energy without leaving waste to utilize the abilities of all contributors and meet the basic needs of all. The Blue Economy will ultimately ensure that development will not only generate economic growth, but also ensuring ecological and social sustainability. In general, the Blue Economy can be understood as an economic model to encourage sustainable development with a mind-set such as the workings of ecosystems. This is not independent of the principles that exist in the Blue Economy concept, namely:

1. Natural resources efficiency;

2. Zero waste: leave nothing to waste – waste for one is a food for another – waste from one process is resource of energy for the other;

3. Social inclusiveness: self-sufficiency for all – social equity-more job, more opportunities for the poor;

4. Cyclic systems of production: endless generation to regeneration, balancing production and consumption;
5. Open-ended innovation and adaptation: the principles of the law of physics and continuous natural adaptation.

Development of Marine and Coastal Tourism:

1. Tourism Destinations that are safe, comfortable, attractive, accessible, environmentally sound, increasing national, regional and community income.

2. Tourism marketing that is synergistic, superior, and responsible for increasing the visits of domestic and foreign tourists.

3. A competitive, credible Tourism Industry, create business partnerships, and being responsible for the natural and socio-cultural environment.

4. Organization of Government, Local Government, private and public, human resources, regulation, and operational mechanism effective and efficient in order to encourage the realization of Sustainable Tourism Development.

The development of the tourism sector can directly increase the incomes of the community, especially local people in each tourist destination. In Socio-political, the development of marine tourism for the tour of the archipelago, can foster and strengthen the love of the country, as well as the unity of the nation.

The tourism development depends on the six elements, such as-

1. Attractions: Generally the focus of attention of visitors and can provide initial motivation for tourists to visit. Attractions can be categorized as a natural tourist attraction (beaches, mountains, parks, weather), buildings and culture.

2. Amenities: Supportive services and facilities include basic infrastructure for visitors, public transportation, and roads and direct services for visitors such as accommodation, visitor information, recreational facilities, guides, operators, and dining and drinking facilities as well as shopping facilities.

3. Accessibility: The ease of visitors to reach the destination by road, air, rail and sea lane.

4. Human Resources: Tourism is a labor-intensive industry and interaction with local communities is an important aspect of tourism experience. Trained tourism workers and communities who realize the benefits and responsibilities associated with tourism growth are an indispensable element and

need to be managed in accordance with tourism destination strategies.

5. Image: Is a unique or an important picture in attracting visitors to visit. Included in the image of the destination are the uniqueness, scenery, scene, environmental quality, safety, service level, and friendliness.

6. Price: Price is an important aspect of competition among tourist destinations. The price factor relates to transportation costs to and from destinations and the cost of accommodation services, attractions, food and tours.

Referring to the blue economic concept, sustainable implementation of the six elements of tourism destinations above can be described. Suppose -
Focus natural attractions: In terms of attractions, need to be created nature attractions that are environmentally friendly and nature conservation. So that there will be no decrease / damage both in terms of environment and the availability of flora and fauna. For example of natural attractions are turtle conservation, coral reef conservation, etc. Areas of tourist attractions that are vulnerable to damage need to be identified, and given the limits of tourism activities that can be done in the area.

Offer environment friendly Amenities: In terms of amenities, need to be used energy source and technologies that are environmentally friendly, for example solar panels, biogas, air conditioning which use freon R23, etc. In addition, it is necessary to build a waste treatment plant on the existing infrastructure such as hotels, resorts, shopping place etc, so that the waste produced can be treated well and not pollute the environment. Infrastructure development should pay attention to the coastal ecosystem area so that the development undertaken does not damage the existing ecosystem. For example the construction of hotels and resorts is not built in the fragile coastal zone or in the estuary.

Introduce transportation of low-carbon emission: In terms of Accessibility, use of modes of transportation that are low emissions, for example electric cars or cars that use euro five emission standards.

Skilled Human Resource: In terms of human resources, knowledge and skills of tourism workers need to be improved. It will create better service and will bring in more tourists so that economic growth will increase.

The Blue Economy Concept can be applied to marine and coastal tourism. The Blue Economy Concept focuses on sustainable development and utilization of natural resources based on environmental conservation. This is in line with the development of sustainable tourism. Application of six elements of tourism destinations in accordance with the blue economy concept also needs to be done.

Marine Tourism	Coastal Tourism
1. Cruising 2. Sailing 3. Scuba diving 4. Underwater fishing 5. Water skiing 6. Windsurfing 7. Tours to maritime parks 8. Wildlife mammal watching 9. Yachting	1. Swimming 2. Sunbathing 3. Coastal walks 4. Second homes 5. Coastal resorts 6. Boating 7. Reef-walking 8. Snorkeling 9. Diving 10. Fishing 11. Dolphin show 12. Water park 13. Lagoon (marine zoo)

In fine, we can say that proper planning and development of Blue Economy can ensure not only the economic growth, but also ecological balance and social sustainability. Hence, we need to develop coastal and maritime tourism in accordance with the principles of the Blue Economy. We need to focus tourism Destinations are safe, comfortable, attractive, accessible, environmentally sound, increasing national, regional and community income.

Photo Credit: Mashrik Faiyaz

SUSTAINABLE TOURISM

The National Tourism Policy of Bangladesh has given emphasis on sustainable tourism development preserving natural resources, involving private sector and local communities with decision making process.

Mohammad Shafiuzzaman Bhuiyan
Deputy Secretary & General Manager, BPC

Tourism is a multidisciplinary subject. It includes various disciplines like geography, ecology, economics, management, marketing and transport studies (Page and Connell, 2006). Tourism is the sector which produces associated products, services and facilities (Edgell and Swanson, 2013). It is often compared to the industry which exports products. At the same time it is treated as such an industry which produces multi products (Youell, 1998). It is a broad economic sector which runs a cluster of interlinked industries (Lejarraga and Walkenhorst, 2007). Tourism includes agricultural, manufacturing, transportation and service providing sectors among others (Timothy, 1998). Weaver and Lawton (2002) say that tourism is the sum of the products and services produced by the interrelated industries. There are many points of view of viewing tourism (Mitchell and Ashley, 2010).

It is believed that tourism contributes significantly to the economic development of local communities of a nation (Deggan, 2007). It develops their economic condition by providing income generating scopes to them. It has a positive socio-cultural impact as well on the local communities of host countries. Social and cultural experiences are exchanged between hosts and guests through meeting new people and cultures by tourism (Youell, 1998). Furthermore, tourism may be viewed as a way to promote peace between states (Timothy, 2003).

Bangladesh is a lovely country with beautiful natural attractions, ancient culture and heritage (Bangladesh National Web Portal, 2012) considered essential for the development of tourism (United Nations World Tourism Organization, 1994). Among the natural attractions it has the longest sandy sea beach in the world, a huge rain forest which is the home of the majestic Royal Bengal Tigers, hills and tea gardens and many beautiful rivers and lakes. Regarding heritage it has very ancient archeological sites covering the period from 300 BC to 1200 AD with Buddhist and Hindu monasteries and structures; a very old city, Dhaka once famous for Moslin cloth and a city of shrines namely Chittagong (Bangladesh Parjatan Corporation, 2000). It has attractive tribal culture along with its mainstream folk songs, dances and dramas and people are hospitable (Hossain and Hossain, 2002). These beautiful aspects can create potentialities for tourism development as tourism development mostly depends on natural attractions and cultural and historical rich heritages (Timothy and Boyd, 2003). There are opportunities as well for the development of nature-based eco-tourism, culture-based and heritage–based sustainable tourism (Shamsuddoha, 2004).

Tourism and sustainable development can be linked (United Nations World Tourism Organization, 2005). The idea of making sustainable development through tourism has been appeared as tourism has a link with it if it is properly managed (United Nations World Tourism Organization, 2005). According to Bruntland (1987), sustainable development is such kind of development that fulfills the needs of the present generation without compromising with the demands of the future generations. While sustainable tourism development is a development that fulfills the needs of present tourists and host people while retaining the capability to fulfill the future needs of them. Sustainable tourism is concerned with the protection of natural environment, preservation of natural resources, biodiversity, culture, heritage and community development (United Nations World Tourism Organization, 2005).

Sustainable tourism has three major elements which are often referred to as the triple bottom line (United Nations Environmental Programme, 2008 cited in Edgell and Swanson, 2013):

i. Regarding environment, sustainable tourism hardly affects natural resources and protected regions. It reduces damages and pollution to the environment (natural habitats of wildlife, flora and fauna, water, aquatic creatures, energy use, etc) and tries to get benefits from the environment even without disturbing the ecological balance of it.

ii. Regarding society and culture, it does not change the existing social system or culture of the local community. It values local customs, traditions, and cultures indeed. It engages various stakeholders such as local communities, government and non - government organizations in all stages - planning, implementing and monitoring - of its development. Even it educates its stakeholders about their responsibilities.

iii. Regarding economy, it makes a good contribution to the overall economy of a host country and especially to the wellbeing of the local people. It generates long term employment scope for the local people and or other stakeholders. In fact, it gives benefits for other stakeholders. In fact, it gives benefits to its owners, employees and neighbours.

At present sustainable tourism has been set as a goal in the development of tourism even in developing countries but it is a challenging goal to achieve for the developing countries because it needs more investments, more experts and more knowledge (Wearing and Neil, 2009).

The National Tourism Policy of Bangladesh has given emphasis on sustainable tourism development preserving natural resources, involving private sector and local communities with decision making process. The government has formulated various essential laws and regulations to ensure sustainable tourism development in Bangladesh. To develop sustainable tourism, four types of stakeholders--government, private sector, the local community and tourists—need to be involved in it. This integrated approach is very essential for sustainable tourism.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

Photo Credit: Bangladesh Television

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং সদ্যস্বাধীন দেশে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে না পারলেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কক্সবাজারের বাহারছড়া সমুদ্র সৈকত এলাকায় গণপূর্ত বিভাগের নির্মিত দু'টি সাইক্লোন সেন্টার কক্সবাজারে আগত পর্যটকদের ব্যবহারের জন্য পর্যটন করপোরেশনের নিকট হস্তান্তর করেন।

মোঃ জাকির হোসেন সিকদার
মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, পরিসংখ্যান ও পূর্ত)
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (সরকারি পর্যটন সংস্থা) দেশের পর্যটনশিল্প উন্নয়নের পথিকৃত। পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতার কিছু আগে পাকিস্তান পর্যটন উন্নয়ন করপোরেশন (পিটিডিসি) গঠিত হওয়ার পর পূর্ব-পাকিস্তানে এর কর্মকাণ্ড সীমিত ছিল। পিটিডিসি'র প্রধান কার্যালয় ছিল হোটেল শেরাটনের বিপরীতে, সাকুরা রেস্তোরাঁ ভবনে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তার প্রতিফলন হিসেবে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৩ বলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। তখন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন মিনিস্ট্রি অব ট্রেড অ্যান্ড কমার্স-এর অধীনে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। এর প্রধান কার্যালয় ১২৫/এ, ইসলাম চেম্বার, মতিঝিলে স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন নূরুল কাদের খান, সচিব পদমর্যাদার তৎকালীন সিএসপি কর্মকর্তা। তিনি মাত্র নয় মাস দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর বঙ্গবন্ধু বর্তমান জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর পিতা এবং বঙ্গবন্ধুর সচিব মো. রফিক উল্লাহ চৌধুরীকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের দ্বিতীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং সদ্যস্বাধীন দেশে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে না পারলেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কক্সবাজারের বাহারছড়া সমুদ্রসৈকত এলাকায় গণপূর্ত বিভাগের নির্মিত দুটি সাইক্লোন-সেন্টার কক্সবাজারে আগত পর্যটকদের ব্যবহারের জন্য করপোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ভবন দুটির সংস্কার এবং ছাত্রদের আবাসনের জন্য পান্থনিবাস নির্মাণের জন্য ১৯৭৩ সালে ১ কোটি টাকা অনুদানও দেওয়া হয়। সাইক্লোন-সেন্টার সংস্কার করে মোটেল উপল ও মোটেল প্রবাল নামকরণ করা হয়। পান্থনিবাস নির্মাণ করে নাম দেওয়া হয় হোটেল লাবনী ও পান্থনিবাস। তখন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অধীনে অ্যাবানডেন্ট প্রপার্টি সাকুরা রেস্তোরাঁ, গুলিস্তানের রুচিতা রেস্তোরাঁ, খুলনার হোটেল সেলিম, ঢাকার হাটখোলা রোডে হোটেল ইলিশিয়াম এবং বগুড়া ও রাজশাহীতে হোটেল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কক্সবাজারে নির্মাণ করা হয় পাঁচটি কটেজ। মতিঝিলে বিমান অফিসের ভবনে ট্রাভেলগ নামে দুটি ট্রাভেল এজেন্সি অফিস খুলে পর্যটন করপোরেশন তা পরিচালনা করত। একই সময় হোটেল পূর্বানী পরিচালনার দায়িত্বও পর্যটন করপোরেশন কে অর্পণ করা হয়। তবে জনবল স্বল্পতার কারণে বেশিদিন পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। পর্যটন খাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির তাগিদ অনুভব করে ১৯৭৪ সালে মোহাম্মদপুরের গজনবি রোডে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সরকার হোটেল ও ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। বঙ্গবন্ধু ন্যাশন্যাল হোটেল ও ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য ইউএনডিপির সহায়তা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ইউএনডিপির মাধ্যমে এর সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু করা হয়। অনুদান, বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিজস্ব তহবিলসহ মোট ২ দশমিক ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মহাখালীতে এনএইচটিটিআই-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়। এ পর্যন্ত এই সংস্থা ৬০ হাজারের বেশি মানবসম্পদ তৈরি করেছে। তাদের অধিকাংশ দেশ-বিদেশে আন্তর্জাতিক মানের হোটেল ও রেস্টুরেন্টে কাজ করে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করছে। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সুবিধার্থে তৎকালীন ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে পর্যটন তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করে লিমুজিন সার্ভিসের মাধ্যমে ভ্রমণ সুবিধা পরিচালনা করা হয়। ট্রানজিট যাত্রীদের সিটি সাইটসিয়িং ট্যুরের ব্যবস্থা করা হয়। একই সময়ে পর্যটকদের জন্য রেন্ট-এ-কার নামে একটি বাণিজ্যিক ইউনিট চালু করে তাতে শতাধিক গাড়ি যুক্ত করা হয়। রেন্ট-এ-কার নামটি পরে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরপর বাগেরহাট, মহাস্থানগড়, ময়নামতি এলাকায় পান্থনিবাস, চা-বাগানের শহর মৌলভীবাজারে রেস্ট হাউস নির্মাণ হয় এবং হাটখোলা রোডে পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে নির্মিত ইলিশিয়াম হোটেল পরিচালনার দায়িত্ব পর্যটন করপোরেশনকে দেয়া হয়। এছাড়া ১৯৮০ সালে নারায়নগঞ্জের পাগলায় ঐতিহ্যবাহী মেরি এন্ডারসান নামে নৌ জাহাজে ভাসমান রেস্তরাঁ এন্ড বার চালু করা হয়।

রাঙ্গামাটিতে বোটক্লাব নির্মাণ করে পর্যটকদের লেকে নৌ-বিহারের ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুল্কমুক্ত বিপণী, চট্টগ্রামে মোটেল নির্মাণ, পাবনার নগরবাড়ী, কুমিল্লার দাউদকান্দি এবং রাজশাহীতে পর্যটন হোটেল নির্মাণ করা হয়। রাঙ্গামাটিতে নির্মাণ করা হয় কাপ্তাই রেস্তোরাঁ ও বার। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হওয়ার পর প্রকল্পের নিরাপত্তা ও জনসাধারণের চলাচল সীমিত করার লক্ষ্যে কাপ্তাই রেস্তোরাঁ ও বারটি তৎকালীন ওয়াপদা অধিগ্রহণ করে। প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ-এর অধীনে আন্তর্জাতিক মানের হোটেল প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্যটন করপোরেশনের তৎকালীন ব্যবস্থাপক (ক্যাটারিং) সালাউদ্দিন আহমেদের প্রচেষ্টায় রাজউকের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদী লিজে হোটেল প্রতিষ্ঠার জন্য ৭৮ লাখ টাকা ব্যয়ে জমির বন্দোবস্ত করা হয়। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তৎকালীন চেয়ারম্যান তাঁর নিকট আত্মীয় এবং সহযোগিতাপূর্ণ মানুষ ছিলেন বলে সেটি সম্ভব হয়েছিল। পরে জাপানের সাথে যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মানের হোটেল নির্মাণের উদ্দেশ্যে আলাদা কোম্পানি গঠন করে জমিটি হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ১৯৮৪ সালে প্রভাবশালী সেনা কর্মকর্তা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল সাহাবউদ্দিন আহমেদ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলে সংস্থার অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। তিনি ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিমানবন্দরে শুল্কমুক্ত বিপণী, কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবাল, সাভার স্মৃতি সৌধের জয় রেস্তোরাঁ, সিলেট পর্যটন মোটেল, চট্টগ্রামের মোটেল সৈকতসহ, কক্সবাজারের অন্যান্য হোটেল-মোটেল আধুনিক করে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে সেবার মান বৃদ্ধি করে পর্যটনের নবযুগের সূচনা করেন। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হোটেল-মোটেল পরিচালনায় পাশাপাশি পর্যটন-শিল্পের বিকাশে দেশি-বিদেশি পর্যটক আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়। সে সময় প্রচুর বিদেশি পর্যটকের আগমন ঘটে। তাঁর সময়ে বেসরকারিভাবেও পর্যটনশিল্পের বিকাশ সাধিত হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ইতিহাসে কর্নেল সৈয়দ সাহাবউদ্দিন আহমেদ পর্যটন করপোরেশনে সবচেয়ে বেশি সময়, চার বছর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর আগে এবং পরে এতটা সময় আর কেউ চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাননি।

১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত পর্যটন করপোরেশনের লোকসান হলেও ১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে কর্নেল সৈয়দ সাহাবুদ্দিন আহমেদের সময় থেকে পর্যটন করপোরেশন মুনাফা অর্জন করতে শুরু করে। ১৯৮৪-৮৫ অর্থবছরে ঋণের বিপরীতে

সংস্থার ডিএসএল পরিশোধের পরও ২ কোটি ৩ লাখ টাকা নিট মুনাফা অর্জন করে। পরে নিট মুনাফা বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা এখনও চলমান। কোভিড-১৯ এর কারণে দুই বছর লোকসান হলেও গত ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২, দুই অর্থ বছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন মুনাফা অর্জন করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সংস্থার পুঞ্জিভূত আয়ের পরিমাণ ২০৪০ দশমিক ৬৯ কোটি টাকা। আয়ের বিপরীতে কয়েক বছরের লোকসান বাদে এবং ঋণের বিপরীতে ঋণ ও সুদসহ ডিএসএল বাবদ ৩৫ কোটি টাকা, সরকারকে লভ্যাংশ পরিশোধ, আয়কর, ভ্যাট এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন পরিশোধের পর পুঞ্জিভূত নিট মুনাফা অর্জন করেছে ৩৫ দশমিক ৬১ কোটি টাকা।

স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত দেশের পর্যটন উন্নয়নে সরকার পর্যটন করপোরেশনকে ১৫ দশমিক ৮১ কোটি টাকা এডিপি ঋণ প্রদান করে। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত চেয়ারম্যান কর্নেল সাহাবউদ্দিন আহমেদ সরকারের কাছ থেকে কোন প্রকার ঋণ বা অনুদান গ্রহণ করেননি। তাঁর সময়ে শুল্কমুক্ত বিপণীর বিকাশ সাধিত হয়। শুল্কমুক্ত বিপণীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা এবং দেশের পর্যটন হোটেল-মোটেলগুলো প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। অর্জিত সেই মুনাফার মাধ্যমে তিনি ২১ দশমিক ৫০ কোটি টাকা নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়োগ করে পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন। এডিপি ঋণের অর্থের বিপরীতে প্রতি বছর সরকারকে ডিএসএল পরিশোধের বাধ্যবাধকতায় ১৯৮৭-৮৮ সাল থেকে ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যন্ত কোন এডিপি ঋণ গ্রহণ করা হয়নি।

১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে ২০০৩-০৪ সাল পর্যন্ত পর্যটন উন্নয়নে এডিপি ঋণ ও অনুদানে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ কোটি এবং ১৫ দশমিক ৬৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের মধ্যে ছিল পার্বত্য অঞ্চলের পর্যটন উন্নয়ন, কক্সবাজার, কুয়াকাটা, সিলেট, যশোর, বেনাপোল, বগুড়া, দিনাজপুর ও রংপুরে পর্যটকদের জন্য আবাসন ও ক্যাটারিং সুবিধা চালু করা। বর্তমানে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সারা দেশে মোট ৫০টি বাণিজ্যিক ইউনিট পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজনৈতিক ও বিভিন্ন কারণে এর ওপর অলাভজনক বিভিন্ন প্রকল্প চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার কারণে পর্যটন করপোরেশন তার স্বাভাবিক ব্যবসায় পরিচালনা করে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

বর্তমান সরকার ক্ষমতার আসার পর দেশের পর্যটনের উন্নয়নে শর্তহীন বিনিয়োগের কারণে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে ঋণের জালে জড়াতে হয়নি। টানা তিন মেয়াদের সরকারের আমলে ২০টি উন্নয়ন প্রকল্পে ২৮৫ দশমিক ২২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে ৩১৬ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দে ৯টি পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পসমূহ আগামী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে। প্রকল্পগুলো হলো চট্টগ্রামের পারকি সমুদ্র -সৈকত এলাকায় ১৩ দশমিক ৩৬ একর জমিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পর্যটনকেন্দ্র নির্মাণ, কক্সবাজারের খুরুশকুলে ৯৫ একর জমির ওপর আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন সুবিধা সৃষ্টির সমীক্ষা প্রকল্প, যেখানে প্রায় ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা সম্ভাব্য বিনিয়োগের সুযোগ থাকবে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৪৪ দশমিক ৫১ একর জমিতে এন্টারটেনমেন্ট সুবিধাসহ পর্যটনকেন্দ্র নির্মাণ, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া এবং সন্দ্বীপে ৩১ একর জমিতে পর্যটনকেন্দ্র নির্মাণ, বরিশালের দুর্গাসাগর এলাকায় পর্যটন সুবিধা নির্মাণ, পঞ্চগড় জেলায় পর্যটনকেন্দ্র নির্মাণ, দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের ৬টি ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহ, নেত্রকোণার হাওর এলাকায় পর্যটনকেন্দ্র নির্মাণ।

মতিঝিলের ইসলাম চেম্বার থেকে প্রধান কার্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়ে ছয়বার অস্থায়ী প্রধান কার্যালয় পরিবর্তনের পর ৫০ বছরে সফল এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হলেও পর্যটন করপোরেশনের স্থায়ী কোন প্রধান কার্যালয় ছিল না। ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭৯ দশমিক ০১২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে পর্যটন ভবন নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দেন। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত আধুনিক স্থাপত্যনকশায় আগারগাঁওয়ে পর্যটন ভবন নির্মাণ কাজ ২০২০ সালের জুন মাসে শেষ হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পর্যটনের প্রতি আনুরাগের কারণে এ ভবন নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। তিন বছর মেয়াদে পর্যটন ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ায় পর্যটন করপোরেশন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উন্নত পরিবেশে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন।

গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ন্যাশন্যাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ এলাকায় মোটেল নির্মাণ এবং হোটেল অবকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পর্যটনবর্ষ প্রকল্পের আওতায় ভ্রমণ পরিচালনার জন্য ৪টি ট্যুরিস্ট কোচ এবং ৪টি মাইক্রোবাস সংগ্রহ করে নিয়মিত ট্যুর এবং প্যাকেজ ট্যুর পরিচালনা করা হচ্ছে। গাজীপুরের সালনায় পর্যটন রিসোর্ট এবং পিকনিকস্পট নির্মাণ, সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা পর্যটনকেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জে শ্রী জ্যোতিবসুর বাড়িতে পর্যটনকেন্দ্র নির্মাণ শেষ হয়েছে। নেত্রকোণা জেলার বিরিশিরিতে, শেরপুরে গজনী অবকাশকেন্দ্র, সিলেট জেলার জৈন্তাপুর ও লালখালে, নাটোরের রাণী ভবানী এবং কুমিল্লার জোরকাননে পর্যটন

সেবাকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ খানজাহান আলী (রাঃ) মাজার এলাকায় সাততলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবনসহ পর্যটনকেন্দ্র নির্মাণ চলমান রয়েছে।

চলতি অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) ৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ৬০ দশমিক ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বর্তমান সরকার পর্যটনকে শিল্প ঘোষণা করেছেন। পর্যটনের উন্নয়নে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন প্রক্রিয়ার কাজটি পরিকল্পনা বিভগের শিল্প ও শক্তি সেক্টরের মাধ্যমে যাচাই-বাছাইয়ে রয়েছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সরকারি খাতে উন্নয়ন ও বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় পর্যটন নীতিমালা-২০১০, বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন ও বিধিমালা, বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড আইন, বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ আইন, বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইনসহ বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। এ কারণে দেশে শতশত ট্রাভেল এজেন্সি ও ট্যুর অপারেটর ব্যবসার সুযোগ পাচ্ছে। এভাবে দেশের অর্থনীতিতে পর্যটন খাতের অবদান দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পর্যটন রাজধানী খ্যাত কক্সবাজারে স্বাধীনতার পর সর্বপ্রথম বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য হোটেল-মোটেল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করে। পরে কক্সবাজারের কলাতলী বিচ এলাকায় হোটেল-মোটেল জোন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

সাগরকন্যা নামে পরিচিতি পাওয়া কুয়াকাটায় ১৯৯৬ সালে পর্যটন করপোরেশন সর্বপ্রথম কুয়াকাটা ইয়ুথ ইন নির্মাণ করে কুয়াকাটা এলাকায় পর্যটন উন্নয়নের সূচনা করে। বর্তমানে কুয়াকাটায় শতশত হোটেল-মোটেল গড়ে উঠেছে। পায়রা বন্দরকে কেন্দ্র করে পরিবেশভিত্তিক পর্যটন জোন প্রতিষ্ঠার মাস্টারপ্লান চলমান রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপিতে পর্যটনশিল্পের অবদান ৩ দশমিক ০২ শতাংশ। এর নেপথ্যে রয়েছে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। ২০৪১ সালের জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের এই অবদান দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা যায়। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত পর্যটন করপোরেশনের মাধ্যমে পর্যটন উন্নয়ন খাতে মোট সরকারি বিনিয়োগ হয়েছে ৫৩৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে পর্যটন করপোরেশনের নিজস্ব তহবিল থেকেই বিনিয়োগ হয়েছে ২০৪ কোটি টাকা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের প্রসিদ্ধ পর্যটন এলাকায় হোটেল-মোটেল, রেস্তোরাঁ ও বিনোদন সেবা ও যাতায়াত সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিরলস-ভাবে সেবা দিয়ে আসছে বাংলদেশ পর্যটন করপোরেশন। পর্যটনের জন্য সম্ভাবনাময় জেলাগুলোতে সুবিধা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটন সেবা আরো বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের।

পর্যটন রাজধানী কক্সবাজারে পর্যটনের ২০৩ একর জমিতে মাস্টারপ্লানের মাধ্যমে পরিকল্পিত পর্যটন ও বিনোদন সুবিধা সৃষ্টির পরিকল্পনা চলমান রয়েছে। কক্সবাজারস্থ খুরুশকুলে ৯৫ একর জমিতে শেখ হাসিনা টাওয়ার ও আন্তর্জাতিকমানের বিভিন্ন পর্যটন সুবিধাসহ পর্যটন জোন নির্মাণ, মোটেল প্রবালের জমিতে পাঁচতারকা হোটেল এবং ওয়াটার অ্যামিউজমেন্ট পার্ক নির্মাণের জন্য ৫০৩ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রস্তাব, বরিশালে পর্যটন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য ১৫৮ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রস্তাব, পায়রা-কুয়াকাটায় পরিকল্পিত পরিবেশভিত্তিক পর্যটন জোন নির্মাণ, টাঙ্গুয়ার হাওড় এলাকার বারেকের টিলায় ২০ একর জমিতে পর্যটনকেন্দ্র নির্মাণ, মহাখালীতে বহুতল বাণিজ্যিক ভবনসহ পর্যটন হাব নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনকের স্মৃতিবিজড়িত বাঘিয়ার তীরে পর্যটন সুবিধা সৃষ্টিসহ মধুমতি হোটেলের সম্প্রসারণ, সিলেট ও খুলনার মুজগুন্নিতে আধুনিক পর্যটন সুবিধা, পদ্মাসেতু এলাকা, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেলের কাছাকাছি পতেঙ্গা এলাকায় পর্যটনকেন্দ্র নির্মাণ, রাজশাহী মোটেলের স্থানে আধুনিক তিনতারকা হোটেল নির্মাণ, চাঁদপুরের মতলব উপজেলার ষাটনলে মেঘনা নদীর তীরে নদীভিত্তিক পর্যটন বিকাশে পর্যটন ও বিনোদন সুবিধা সৃষ্টির পরিকল্পনা রয়েছে। সুন্দরবনের পেরিফেরি জেলার পর্যটনের আকর্ষণীয় স্থানে নানা রকম সুবিধাসহ দেশে আরো অনেক জায়গায় পর্যটন উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন।

১৯৭৩ সালে ৮০ হাজার টাকা আয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। ৫০ বছরে বার্ষিক এ আয় দাঁড়িয়েছে ১৫০ কোটি টাকায়। রাজস্ব খাতে সরকারের কোনরূপ আর্থিক সহায়তা ছাড়াই নিজস্ব আয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধ, হোটেল-মোটেল রক্ষণাবেক্ষন ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করে লাভজনক বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০০৫ সাল থেকে পর্যটন করপোরেশনে পেনশন চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৪২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিজস্ব আয় থেকে পেনশন প্রদান করা হয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

পর্যটনের অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। দিনে দিনে পর্যটনের এ সম্ভবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে পর্যটন করপোরেশন এগিয়ে যাবে তার আপন মহিমায়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন হবে দেশের পর্যটনশিল্পের বাতিঘর।

Photo Credit: alightindia.com

PROTECTING RIVER AND WATER BODIES FOR TOURISM DEVELOPMENT

We must be 'respectful' to our nature. If all the rivers and water bodies are exterminated then tourism will not survive. Therefore, for the sake of tourism, we must protect our water and water bodies.

Md. Ziaul Haque Howlader
Manager (PR), Bangladesh Parjatan Corporation

River is as essential for human life, as important element for the development of tourism industry. Tourism industry is inextricably intertwined with rivers and water all over the world. At the present global phenomenon of tourism, water is the main focus for the development of eco-tourism, riverine tourism, adventurous tourism, etc. Some countries are famous for water based tourism activities like river cruising, sea-cruising, scuba diving, snorkeling, surfing, kayaking, rafting, boating, visiting to sea-aquarium, watching the under-water world activities, para-gliding, drifting, bird-watching, etc. The major tourism attractions are taking place at water based tourism attractions like Haor, Baor, sea, rivers, sea-coast, visiting mangrove forest, and many more. Sea-cruising in European countries in the Pacific or the Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea or other seas and also in the major rivers like the Amazon, the Nile, the Rhine and the Chaophraya rivers is really amazing.

There are many countries that develop tourism either at sea coast, near the rivers or big water bodies. Dal Lake in Kashmir, rivers and canals in Kerala, Bali in Indonesia, Okinawa in Japan, Maldives, Fiji, Hawaii, Gambia, Caribbean Islands, Mauritius, Moses Lakes in Washington etc. as a whole are world class water based tourist attractions.

Earlier, for tourism activities water bodies were not integratedly included in the part of conservation and preservation or maintenance activities. But with the passage of timeof tourism development activities, this is

being focused in many countries.

Bangladesh is a country of rivers and many big water bodies like Tangua Haor and Hakaluki Haor (both are Ramsar Sites), Baikkaar Beel, etc. These haor are very attractive places with serene water and green vegetation along the bank. Tourists visit these sites for bird watching and relish the fresh fishes. Some tour operators also offer river-cruising there. Many foreign tourists commented that visiting Tangua Haor was a life-time experience for them.

Bangladesh is world-wide famous for its hundreds of serpentine rivers and canals. And the country is also famous for river cruising down its mighty rivers – the Padma, the Meghna, and the Jamuna and the Kushiara. Bangladesh possesses a great potential to develop tourism based on water and water bodies. River cruising in this country are unique as there are thousands of villages and rural markets grown up at both the sides of rivers. Tourists can also see the vast crops lands alongside the rivers. They can also have a glance the rural people are very active in the fields. Moreover, the scenery of catching Hilsha fish is a great attraction to tourists.

The lakes in capital city like Dhanmondi Lake, Gulshan and Banani Lakes also draw many local people especially during the holidays. We have to contain pollution to these lakes. Some unscrupulous people throw chips packet and pet bottles, etc. into lakes and water bodies etc. that are alarming. We have already caused irreparable harms to the Burignaga. This Buriganga river was once famous for river cruising. Recently, the government has initiated a circular water way programme which may also be attractive to the day visitors.

Our Rangamati Lake is a wonderful lake for swimming, boating and river cruising. Once I was in Rangmati for 15 days. I found three American tourists were swimming in Rangamati Lake near the Parjatan motel. They were happy enough by being able in swimming the lake. River cruise in Rangmati Lake just can be amazing.

We should protect all the canals, lake and water bodies located in and around the capital city Dhaka. We all know that Amsterdam is the most water way city in the world. Its waterways have always been essence and its source of wealth. Its beautiful canals and harbours fill a full quarter of her surface. In the Summer time, these canals are filled with cruising boats. An Amsterdam cruise is one of the most popular tourist attractions in the country. A diverse fleet of around 250 cruise boats carry more than 3.20 million tourists a year offering a waterborne variety of almost every form of entertainment that's available in Amsterdam. The municipality strictly maintains its regulations that do not allow many canal side terraces in Amsterdam.

At present, the water in the canals of Amsterdam is cleaner than it has ever been in their history, whereas we are going down. Three times a week, 14 of the 16 existing water locks around the city close up, so clean water can be pumped in from the big lake Ijsselmeer. The current that creates pushes the dirty canal water out through the open locks on the other side of the city. Specialized cleaning boats with big scoops and nets patrol frequently to clean surface dirt. Since 2005, all the houseboats in the city are connected to the sewer system. The cleaner water has attracted life. About 20 different species of fish and crabs live a healthy life below the surface. That bounty attracts water birds like herons, ducks, coots, gulls and recently even cormorants.

As Dhaka possesses immense potential like the Netherlands, we can organize boating, kayaking and yachting in these lakes. We know from the history that there are lots of canals, creeks and rivers in and around the Dhaka. But we have already filled in those and have destroyed our ecological balance that has contributed to make Dhaka as a non-livable city.

The UNWTO also emphasizes the tourism's significant role and contribution to world-wide water conservation efforts. The global theme of the world tourism day in 2013 was in line with the UN General Assembly's declaration of 2013 as the United Nations International Year of Water Cooperation, providing the opportunity to further highlight the shared responsibility of the tourism sector to the wider sustainability objectives.

For the sustainable development of tourism, we must protect our water and water bodies. We must be careful the pet-bottles, trashes

may install litter-bins and proper signage at visible places of tourist sites. Some volunteer organizations may come forward for waste collections at least once or twice in a week. There may be a project for waste collection and waste recycles. Local people may be involved in the activities and they may be rewarded. There should be a provision of Do's and Don'ts. We have to check while river cruising we don't throw away any waste to the rivers. The hotels and motels and other tourist facilities that are being established must have Effluent Treatment Plant. This ETP is most essential at St. Martin Island. We should remember that we came here with many things, and return leaving nothing only sweet memory. We must be 'respectful' to our nature. If all the rivers and water bodies are exterminated then tourism will not survive. Therefore, for the sake of tourism, we must protect our water and water bodies.

পর্যটনশিল্পে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নে পর্যটন করপোরেশনের ভূমিকা

এনএইচটিটিআই দক্ষ পর্যটনকর্মী তৈরি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে যে অবদান রাখছে, সেটা সাদা চোখে দৃশ্যমান না হলেও এর অর্থমূল্য হাজার কোটি টাকা।

জাহিদা বেগম
বিভাগীয় প্রধান, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন
ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পর্যটনশিল্প বিকাশে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন চালু করেন। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পাকিস্তানি জান্তা যখন পোড়া মাটিতে পরিণত করেছিল, যখন খাবার, বাসস্থানসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চরম সংকট চলছিল, তখন এ রকম সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ অচিন্তনীয়। এতেই থেমে থাকেনি বঙ্গবন্ধুর সরকার। দেশে পর্যটনশিল্পে দক্ষ কর্মী তৈরির জন্য ১৯৭৩ সালে নেওয়া হয় জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ।

এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) যা এ জাতীয় প্রশিক্ষণের পথিকৃত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। গত ৪৮ বছরে এই প্রতিষ্ঠান প্রায় ৬০ হাজার দক্ষ ও বিশ্বমানের হোটেল ও পর্যটনকর্মী তৈরি করেছে। প্রথম দুই দশকে ইউএনডিপি এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও) এর বিশেষজ্ঞরা ৪টি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে এনএইচটিটিআইতে এসে এখানকার

প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছেন এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও অনুসৃত কারিকুলাম প্রস্তুত ও নির্ধারণ করেছেন। সেই ধারায় এই প্রতিষ্ঠান থেকে বর্তমানে প্রায় ১ হাজার শেফ সহ ২ হাজার হোটেল-পর্যটনকর্মী প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশ, ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যেও বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন। একই সঙ্গে অনেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে উদ্যোক্তা হয়ে হোটেল, রিসোর্ট, রেস্তোরাঁসহ অন্যান্য পর্যটনসংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করছেন।

এনএইচটিটিআই প্রতিষ্ঠার পর নারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল কম। পরে অল্প সংখ্যক নারী মূলতঃ রিসেপশন ও ট্যুর অপারেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। কেউ কেউ রান্না শেখার জন্য প্রশিক্ষণ নিলেও, একজন নারী হোটেলের শেফ হবেন এই ভাবনা তখন ছিল না। তা ছাড়া অভিভাবকেরা এমনিতেই মেয়েদের হোটেলে কাজ করতে দিতে রাজি ছিলেন না। তারা ভাবতেন, এখানে নারীদের নিরাপত্তার ঘাটতি রয়েছে। ২০০০ সালে আমি এই সংস্থায় যোগ দিই এবং ২০০৩ সালে এনএইচটিটিআই-এর রন্ধন প্রশিক্ষণ বিভাগে আমাকে প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে বদলি করা হয়। তখন থেকেই লক্ষ্য করি প্রশিক্ষণে নারীর অংশ কম।

১৭ থেকে ৩০ বছর বয়সী মেয়েদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারি, তারা হোটেলে শেফ হিসেবে কাজ করতে অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু তারা পরিবারের অনুমতি পায় না। এরপর ক্রমাগত অভিভাবকদের সাথে ফোনে বা সরাসরি কাউন্সিলিং শুরু করি। আস্তে আস্তে এই প্রশিক্ষণে বাড়তে থাকল মেয়েদের অংশগ্রহণ। পাশাপাশি হোটেলে জিএম, এইচআর ব্যবস্থাপক, এক্সিকিউটিভ শেফসহ বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগ করে হোটেলে নারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টির অনুরোধ জানাই। ঘরে রান্না সংক্রান্ত কাজ নারীরা করলেও, তারকা হোটেল ও রেস্তোরাঁয় শেফ হিসেবে শুধু পুরুষদেরই দেখা যেত। সেই অবস্থা ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। পুরুষ শেফরাও শিক্ষানবিস নারী শেফদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াচ্ছেন।

আমাদের অনেক ছাত্রী হোটেলের শেফ হিসেবে চাকরির পাশাপাশি নিজের ঘরে গৃহিনীর ভূমিকাও পালন করে যাচ্ছেন। বর্তমানে ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন বা রন্ধন প্রশিক্ষণ বিভাগে নারীদের অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশের বেশি। উল্লেখ করার মতো আরও একটি বিষয় হচ্ছে, একটা সময় পর্যন্ত কেবল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তরুণরাই শেফ হতে চাইতো। বৃহত্তম সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মুসলিম তরুণদের মধ্যে শেফ হওয়ার আগ্রহ কম ছিল। অনেকেই এ পেশাকে 'বাবুর্চি' বলে ঠাট্টা করতেন। কিন্তু দেখা যেত, সেই ঠাট্টাকারী ব্যক্তিটি উন্নত দেশে গিয়ে রেস্তোরাঁতে কাজ পেয়েছেন। কিন্তু রান্না ও এর ব্যাকরণ না জানায় কেবল প্লেট ধোয়ার কাজ করতে হয়। অন্যদিকে সমগ্র পৃথিবীতে শেফদের সম্মানের চোখে দেখা হয়।

পর্যটনশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে হোটেল-রেস্তোরাঁর সংখ্যা বেড়েছে। দেখা যাচ্ছে তারকা হোটেলে শেফের বেতন ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত হয়। এনএইচটিটিআই-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নবীন শেফরাও ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা বেতনে কাজে যোগ দেয়। বর্তমানে বাংলাদেশের হোটেল ও পর্যটন সেক্টরে কাজ জানা বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা বেকার থাকে না।

এনএইচটিটিআই-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা ইউরোপ-আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে শুধু কাজই করছেন না, তাদের অনেকে সেসব দেশে উদ্যোক্তা হয়ে নিজেরাই একাধিক হোটেল-রেস্তোরাঁর মালিক হয়েছেন।

২০২০ ও ২০২১ পৃথিবীতে করোনা ভাইরাসের কারণে যে অন্ধকার নেমে এসেছিল, তার সবচেয়ে বড় শিকার পর্যটনশিল্প। কিন্তু এই সময়ে বাংলাদেশে অনলাইনভিত্তিক ক্যাটারিং ব্যবসায় প্রসার লাভ করে। এই ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উদ্যোক্তা নারী। সম্প্রতি মফস্বল কিংবা গ্রামেও অনলাইন ক্যাটারিং ব্যবসা করে অনেক নারীকে স্বাবলম্বী হতে দেখা যাচ্ছে। এ নারী উদ্যোক্তাদের অনেকেই এনএইচটিটিআইতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

সামাজিক ও গণমাধ্যমের প্রসার নারীদের ব্যাপক সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এনএইচটিটিআই-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের অনেকেই বর্তমানে বিভিন্ন টিভি মিডিয়াতে নিয়মিত কুকিং শো উপস্থাপনা কিংবা অংশগ্রহণ করছেন। উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ইউটিউবে চ্যানেল খুলে কুকিং শো করেও আয় করছে। এ ছাড়াও আমাদের অনেক ছাত্রী ছোট ছোট কুকিং স্কুল খুলে রান্না শেখাচ্ছে।

এনএইচটিটিআই বিদেশের জন্য দক্ষ পর্যটনকর্মী তৈরি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে যে অবদান রাখছে, সেটা সাদা চোখে দৃশ্যমান না হলেও এর অর্থমূল্য হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের এ সাফল্য দেখে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড তাদের কারিকুলামে হোটেল-পর্যটনবিষয়ক বিভাগ খুলেছে এবং দেশব্যাপী অসংখ্য পর্যটন-হোটেল ও কালিনারি ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে। এ সকল প্রশিক্ষণে বিশ্বমান নিশ্চিত করা সম্ভব হলে বাংলাদেশে বেকার সমস্যার সমাধান ও নারীর ক্ষমতায়নে বড় ধরণের অগ্রগতি সম্ভব হবে।

পর্যটনে নারীদের এই অগ্রযাত্রা অব্যহত থাকলে আমরা অবশ্যই ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

Photo Credit: Ekramul Hoque Rabbani

বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের বিকাশ

দেশের প্রতিটি গ্রামকেই পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করা সম্ভব। এজন্য প্রতিটি এলাকায় উপযুক্ত পর্যটন অবকাঠামো এবং নিরাপদ খাবার ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থাসহ প্রশিক্ষিত ও বিশেষভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত ট্যুর গাইডিং কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হলে অভ্যন্তরীণ পর্যটন ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে।

শেখ মেহদি হাসান
উপ-ব্যবস্থাপক (বিপণন), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

১৯৭১ সালে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত, প্রায় ৪ লক্ষ নারীর সম্ভ্রম ও অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের দুঃসাহসিক সংগ্রামের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় প্রতিটি শিল্পের মতো পর্যটনশিল্পের পথচলাও শূন্য হাতেই শুরু হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে; যখন দু'মুঠো অন্ন যোগাড় করাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, সে রকম একটি কঠিন সময়ে তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প গড়ে তুলতে ১৯৭২ সালের ২৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৩ অনুযায়ী চালু করেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। সংস্থাটি ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পথচলা শুরু করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর বাংলাদেশের ললাটে চরম দুর্ভাগ্য নেমে আসে। সেদিন থেকেই দেশে পর্যটনের মতো একটি সম্ভাবনাময় শিল্পের অগ্রগতিও শ্লথ হয়ে পড়ে। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার আগে কোন সরকারের সময়েই পর্যটন গুরুত্ব পায়নি। অগ্রগতি না হওয়ার পেছনে নীতিগত সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি পর্যটন খাতে সরকারি ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ না হওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বিশেষ করে এ খাতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ খুবই কম। দুই দশক পূর্বেও ঢাকা শহরে ৪-৫টি পাঁচতারকা মানের হোটেল ছাড়া সমগ্র দেশেই তারকা মানের হোটেল প্রায় ছিলই না। অন্যদিকে পর্যটন করপোরেশন একটি স্বশাসিত বাণিজ্যিক সংস্থা হওয়ায় শুরু থেকেই সংস্থাটি আয় থেকে দায় শোধ করতে গিয়ে অস্তিত্বের সংগ্রাম করে গেছে ৫০ বছর।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের পর্যটনকে একটি শিল্প হিসেবে এর বিকাশ, উন্নয়ন ও পর্যটন আকর্ষণগুলো বিপণনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জন্মলগ্ন থেকেই এই সংস্থাটিকে দ্বৈত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। একটি হচ্ছে 'পর্যটনশিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন' এবং অন্যটি সারাদেশে 'পর্যটকদের জন্য সুবিধা সৃষ্টি এবং সেগুলোকে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা' করা। এখন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান সারা দেশে পর্যটকদের সেবা প্রদানের জন্য ডেস্টিনেশনভিত্তিক বিভিন্ন সুবিধাদি যেমন হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, বার, পিকনিকস্পট, সুইমিং পুল, পর্যটন তথ্যকেন্দ্র, পর্যটনকেন্দ্র চালু করেছে। এ ছাড়া দেশি-বিদেশি যাত্রীদের সুবিধার্থে ১৯৭৫ সাল থেকে দেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহে শুল্কমুক্ত বিপণী পরিচালনা করে আসছে। পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন ছাড়াও সংস্থাটি পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে ১৯৭৪ সালে মহাখালীতে স্থাপন করে জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা এনএইচটিটিআই। এই প্রতিষ্ঠান ৬০ হাজারের বেশি দক্ষ হোটেল ও পর্যটনকর্মী তৈরি করে দেশ ও পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে।

সুপ্রাচীন পরিব্রাজক থেকে শুরু করে সমকালীন কবি-সাহিত্যিকেরা তাঁদের লেখায় বাংলাদেশের ঋতু ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। কক্সবাজারে পৃথিবীর দীর্ঘতম সৈকত, মোংলায় পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন ও কুয়াকাটা সৈকতে রয়েছে একই স্থান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার বিরল সুযোগ। রয়েছে অসংখ্য পাহাড়, হাওর-বাওরবেষ্টিত অপূর্ব সুন্দর বিস্তৃত জলাভূমি। তবে এ দেশের পর্যটনের প্রধান আকর্ষণ নদী, নৌযান ও নদীভিত্তিক সংস্কৃতিকে ব্র্যান্ডিং করা জরুরি যা করা হয়ে ওঠেনি। এমনকি কক্সবাজার সৈকত বা সুন্দরবনও বিদেশি পর্যটকদের কাছে তেমন পরিচিত নয়।

অন্যদিকে এ দেশের অন্যতম আকর্ষণ হতে পারে আমাদের ভাবসম্পদ, লালন-হাসনের গান, জারি-সারি গান, ভাটিয়ালি গান। এই ভাবসম্পদকে ইউএসপি (ইউনিক সেলিং পয়েন্ট) দাবি করা যায়। কিন্তু এগুলোকে পর্যটন পণ্য হিসেবে উপস্থাপনের কাজটি এখনো বাকি রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশে ১ হাজার ৫২৯টি পর্যটনকেন্দ্র বা আকর্ষণ চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে হয়তো ৫০টি কেন্দ্র মানুষের কাছে পরিচিত। এ কেন্দ্রগুলোকে পর্যটন গন্তব্য হিসেবে উন্নয়ন করা জরুরি। দেশের পর্যটন রাজধানী কক্সবাজার জেলার আয়তন প্রায় ২৫০০ বর্গ কিলোমিটার হলেও প্রায় ৯০ ভাগ পর্যটন স্থাপনা এই জেলার মূল শহর ২৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় সীমাবদ্ধ। যদিও সম্প্রতি ইনানীভিত্তিক একটি স্বতন্ত্র পর্যটন জোন তৈরি হয়েছে। কিন্তু একে পরিকল্পনা, সমন্বয় ও পরিবেশ-বান্ধব স্থাপনানির্মাণ নীতির আওতায় নিয়ে আসা উচিত। কক্সবাজার মূল শহরকে বর্তমানে ইট-কংক্রিটের এক নগরী বলা যায়। কক্সবাজারে পৃথিবীর দীর্ঘতম (১২০ কি.মি.) ও একটানা বালুকাময় সৈকত থাকলেও পর্যটন সুবিধার অপ্রতুলতা ও বিশ্বব্যাপী বিপণন না থাকার কারণে এই সৈকতের ৯০ ভাগই অব্যবহৃত থাকে। অথচ থাইল্যান্ডে এক কি.মি. দীর্ঘ সৈকতেও অগণিত পর্যটক দেখা যায়। কক্সবাজারের প্রায় শেষ প্রান্তে সাবরাং ট্যুরিজম পার্কের জন্য ১ হাজার ১৬৪ একর জায়গা পর্যটন করপোরেশনকে দেওয়া হয়। কিন্তু এত বিশাল ট্যুরিজম পার্ক করার মতো পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় ২০১৫ সালে একে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) হাতে অর্পণ করা হয়।

বেজা সোনাদিয়া ইকোট্যুরিজম পার্ক ও টেকনাফে নাফ ট্যুরিজম পার্ক নামে আরো দুটি পর্যটন অঞ্চল গড়বে বলে ঘোষণা দিয়েছে। তিনটি পার্কে ৫ তারকা হোটেল ও রেস্তোরাঁ, হানিমুনপার্ক, রিসোর্ট, ঝুলন্ত রেস্তোরাঁ, শিশুপার্ক, ইকো-কটেজ, সুইমিং পুল, ফান লেক, একুয়াপার্ক, গলফ কোর্স, আন্তর্জাতিকমানের হাসপাতাল -বিশ্ববিদ্যালয়-স্কুল, থিম ক্রুজ, বহুমূখী ফুড কোর্ট, থিমড প্যাভিলিয়ন, বনাঞ্চল, জগিং ট্র্যাক, রাত্রিকালীন ক্যাম্প, পরিবেশবান্ধব রিসোর্ট, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো, বিনোদন অঞ্চল, কেবলকার, আকাশ সেতু, সমুদ্র জাদুঘর, জল-ক্রীড়া কমপ্লেক্স, গেম পেরোল, পাখি দর্শন টাওয়ার, হার্বার ব্রিজ, ঝুলন্ত ব্রিজ, বিনোদন ব্যবসায়িক-ক্রীড়া ও ঝুঁকিযুক্ত পর্যটন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পর্যটন ইত্যাদির সমাহার থাকবে বলে বেজার ওয়েবসাইটে উল্লেখ রয়েছে। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হাট -হাজারী থেকে কক্সবাজার রেললাইন ও কক্সবাজারে অপূর্ব নান্দনিক নকশার রেলস্টেশন স্থাপন এবং কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার কাজ প্রায় শেষের পথে। এই কাজগুলো শেষ হলে কক্সবাজারকেন্দ্রীক পর্যটনে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় যোগাযোগব্যবস্থা নদীভিত্তিক হওয়ার কথা ছিল। বিশেষত পর্যটনশিল্প বিকাশে অন্যতম অনুষঙ্গ হতে পারতো নদীপথ। পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ হলেও আয়তন অনুপাতে ব্যাপক বৈচিত্র্যময় ৭০০ ছোটবড় নদীর এই দেশ নদীর জন্যই পরিচিত হতে পারতো বিশ্বে। প্রাচীনকাল থেকে ঢাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে পরিণত হওয়ার অন্যতম কারণ বুড়িগঙ্গাকে শুধু বুড়ি বানিয়ে দেওয়াই নয়, বর্তমানে নদীটি কুৎসিত চেহারার এক ভয়ানক দূষিত নদীতে পরিণত হয়েছে। বাকি নদীগুলো কমবেশি দখলদারদের লোভের কারণে মৃতপ্রায়। এককালে যে নদীতে চলত ছোট জাহাজ, আজ সেটি পরিণত হয়েছে চিকন খালে, নয়তো ভরাট করে ঘরবাড়ি বানিয়ে নিয়েছে দখলদারেরা।

মুডি ইনডেক্স-এর র‍্যাংকিং-এ পর্যটনশিল্পে বিশ্বের ১৮৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪১তম, আর এশিয়ার ৪৬টি দেশের মধ্যে ৪২তম। বিবিএসের জরিপ অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ অর্থবছরেই ২৯ লাখ ২১ হাজার ৫২০ বাংলাদেশি পর্যটক বিদেশে গেছেন। তাঁদের ৬০ শতাংশের বেশি গেছেন ভারতে। এ ছাড়া সৌদি আরবে ৮.১২%, মালয়েশিয়ায় গেছেন ৪.৫৭%। এ ছাড়াও থাইল্যান্ড, দুবাই, আফ্রিকা, নেপাল, তুরস্কে গেছেন তারা। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ৩ লাখ ৩৬ হাজার ৮৬৮ মিলিয়ন টাকা (সূত্র: *প্রথম আলো*)। আগত বিদেশি পর্যটকের তুলনায় যদি বহির্গামী দেশিয় পর্যটকের সংখ্যা ও ব্যয় বেশি হয়, তাহলে দেশের অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব অনিবার্য। দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা উন্নত করা গেলে অন্তত স্বাস্থ্যপর্যটন ও চিকিৎসার জন্য বিদেশ ভ্রমণ কমে যেত, তাতে প্রচুর অর্থ দেশে থাকতো।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'ট্যুরিজম স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট ২০২০' শীর্ষক একটি জরিপ অনুযায়ী, আট বিভাগীয় সদর দপ্তর, ৫৬টি জেলা সদর এবং পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে অবস্থিত হোটেল, মোটেল ও রেস্তোরাঁয় কাজ করেন ১ লাখ ২৭ হাজার ৭৮ কর্মী। তাঁদের মধ্যে নিয়মিত কর্মী প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার ও খণ্ডকালীন প্রায় ১৪ হাজার। নিয়মিত কর্মীদের মধ্যে পুরুষ ৯২ ও নারী ৮ শতাংশ। আর খণ্ডকালীন কর্মীদের মধ্যে পুরুষ ৮১ ও নারী প্রায় ১৯ শতাংশ (সূত্র: *প্রথম আলো*)। দেখা যাচ্ছে, পর্যটনশিল্পে নারীর ক্ষমতায়ন এখনো সন্তোষজনক নয়। এই শিল্পের অন্যতম অনুষঙ্গ হোটেল। পর্যটন করপোরেশনের হোটেল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এনএইচটিটিআই নারীর ক্ষমতায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এখানে বরাবরই নারীদের প্রশিক্ষণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ যাবতীয় প্রণোদনা দিয়ে আসছে। বর্তমানে এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কুকিং বা শেফ-এর কাজে নারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত পুরুষের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে, মানসম্মত ও তারকাহোটেল-রেস্তোরাঁয় নারী কর্মীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি রাত বেশি হলে গাড়িতে করে বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়। তবে হোটেল প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের সমস্যা রয়েছে।

সম্প্রতি বিদেশি দাতাসংস্থা ও সরকার মিলে একটি তহবিল গঠন করে এসইআইপি (সেইপ) নামক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাইভেট ইনস্টিটিউটকে হোটেল ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য বিষয়ে ফ্রি দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সম্পদ হচ্ছে এর সক্ষম জনগোষ্ঠী, যাকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড হিসেবে অভিহিত করা হয়। দেশের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। এ বিশাল সংখ্যক কর্মক্ষম জনসংখ্যা থাকলেও এদের বড় অংশটিই অদক্ষ বা স্বল্প দক্ষ। পৃথিবীব্যাপী হোটেল-পর্যটন বৃহত্তম শিল্প। প্রতি ৭ জনে ১ জন মানুষ এই শিল্পে নিয়োজিত। দেশের সক্ষম মানুষকে যথাযথ দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিতে পারলে এই সুবিশাল কাজের বাজারে প্রবেশ করে দেশের অর্থনীতিকে বহুগুণ শক্তিশালী করা সম্ভব।

৭১ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত হয় বাংলাদেশ। তার ওপর হেনরি কিসিঞ্জারের 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র যে ভাবমূর্তি বাংলাদেশের তৈরি হয়েছিল, তার সাথে বন্যা-ঝড়-দারিদ্রের নিত্য ছাপ আন্তর্জাতিকভাবে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। যদিও ঐতিহাসিক ভাবে এদেশের মানুষের আতিথেয়তার সুনাম বরাবরই ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে দেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠে এলেও বিদেশি পর্যটক আগমনের হার এখনো জাতীয় আয়ে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারেনি। অতীতে ভারতীয় পর্যটক আগমন সর্বোচ্চ থাকলেও সম্প্রতি বিদেশি আগমনের ক্ষেত্রে চীনারাই সর্বোচ্চ। তবে তারা এখানে আসেন মূলত ব্যবসার কাজেই।

এ অবস্থায় অভ্যন্তরীণ পর্যটনে জোর দেওয়া উচিত। বিশেষত ঢাকায় যারা থাকেন, তাদের অনেকেরই গ্রামের বাড়ি নেই। কিন্তু তাদের সন্তানেরা দাদাবাড়ির স্বাদ পেতে চায়। এই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই বিভিন্ন দেশে হোমস্টে, কম্যুনিটি ট্যুরিজম বা পর্যটন গ্রামের মতো বিভিন্ন মডেল পর্যটন গড়ে উঠেছে। কিন্তু বাংলাদেশে গ্রামকেন্দ্রিক সম্প্রদায়ভিত্তিক পর্যটন কাঠামো এখনো সুসমন্বিতভাবে গড়ে ওঠেনি। তবে কিছু প্রচেষ্টা পরিলক্ষি হচ্ছে। যথাযথ প্রক্রিয়ায় টেকসই কম্যুনিটি বেজড ট্যুরিজম গড়ে তুলতে পারলে অভ্যন্তরীণ পর্যটন বিকশিত হবে। এতে ফুড ট্যুরিজমও অগ্রগতি লাভ করবে। আর তখনি কেবল জাতীয় রাজস্ব আয়ে অবদান রাখার মতো একটি পর্যটন অর্থনীতি সৃষ্টি হবে। অভ্যন্তরীণ পর্যটন বাড়লে আন্তর্জাতিক পর্যটক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়বে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক পর্যটনের প্রসার বা বিদেশি পর্যটকের আগমন অপ্রতুল হওয়ার পেছনে একটি বাধা দৃষ্টিভঙ্গি। এটা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্রসহ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পৃথিবীর অনেক দেশেই ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও সেখানে বিদেশি পর্যটকের যাতায়াত হার বাংলাদেশের থেকে বেশি। এর মূল কারণ হলো তারা নিজেদের আচরণের সাথে একজন পর্যটকের আচরণের তফাতকে অনুমোদন করে। দেশে অভ্যন্তরীণ পর্যটন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তরুণরা। তরুণীরাও এখন ভ্রমণ করছেন। এমনকি একাও ঘুরতে বের হচ্ছেন। তারাও বিভিন্ন ধরণের প্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গি ও নিরাপত্তার সমস্যায় পড়ছেন। কেবল পুলিশিং এসব সমস্যার সমাধান নয়। প্রয়োজন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং নারীদের পর্যটনের অধিকারকে সর্বস্তরে স্বীকৃতি দেওয়া। একজন পর্যটকের সাথে কেমন আচরণ

করতে হবে, সেটা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই শেখানো উচিত। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এই বিষয়গুলো দ্রুত অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রে অ্যালকোহল নিয়ে অস্বাভাবিক রক্ষণশীলতা রয়েছে। ফলে মানসম্মত অ্যালকোহল এখানে দুষ্প্রাপ্য। এমনকি বিয়ারের মতো পানীয় সহজে পাওয়া যায় না। বিদেশি অ্যালকোহলকে বিলাসদ্রব্য বিবেচনায় এর ওপর প্রায় ৩০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়। ফলে পাওয়া গেলেও এর দাম হয় অত্যাধিক। বিদেশিদের জন্য মানসম্মত অ্যালকোহল সহজলভ্য করা যেতে পারে।

সাধারণত বিদেশি পর্যটকেরা নাইট লাইফ প্রত্যাশা করেন। কিন্তু ঢাকা শহরের তারকাহোটেল ছাড়া ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে এ রকম রেস্তোরাঁ নেই। দেশের কোন পর্যটন গন্তব্যে, এমনকি পর্যটন রাজধানী কক্সবাজারেও নাইট লাইফের কোন উপাদান নেই। ফলে পর্যটনস্থানে বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যার পর পর্যটকদের বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা অলস সময় পার করেন। বাংলাদেশে পর্যটনের আরেকটি বড় সমস্যা হলো এ দেশের আবাসিক হোটেলের উচ্চমূল্য। ঢাকায় একটি মানসম্মত কক্ষে থাকতে গেলে ৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়। অথচ মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ১ হাজার টাকায় এসি কক্ষে থাকা যায়। পর্যটন গন্তব্যে সব রকম পর্যটকের আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা থাকা বাঞ্চনীয়। এ ছাড়া ঢাকা বা অন্যান্য শহরে স্বাস্থ্যসম্মত স্ট্রিট ফুড পাওয়া যায় না। খাবারের নামে যা বিক্রি হয়, সেগুলো স্বাস্থ্যের জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এবং তাতে হাইজিনের কোন বালাই নেই। তাই স্ট্রিট ফুড ভেন্ডরদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ থাকা জরুরি।

জাতীয় বাজেটে বিমানচলাচল কর্তৃপক্ষ ও বিমানের জন্য উল্লেখযোগ্য বাজেট থাকে। পর্যটন খাতে সে রকম বাজেট থাকে না। দেশের পর্যটন নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচারণা ও বিপণন যেটুকু হয়, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। পর্যটনে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে এগিয়ে আসা উচিত। বিশেষ পর্যটন অঞ্চলগুলো সফলভাবে চালু করা সম্ভব হলে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন এ খাতের চালচিত্র অনেকটাই পাল্টে দিতে পারে। সহজ শর্তে ঋণদান করে ব্যক্তি উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য সরকার, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এগিয়ে আসা উচিত।

যোগাযোগ যে পর্যটন বিকাশে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা পদ্মাসেতু নির্মাণে প্রমাণ হয়েছে। পদ্মাসেতু উদ্বোধনের অব্যবহিত পরই পর্যটন করপোরেশন মাত্র ৯৯৯ টাকায় পদ্মাসেতু হয়ে ভাঙ্গা পর্যন্ত অর্ধদিবসের একটি ভ্রমণ চালু করে। এই ট্যুরটি ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এমনকি এতে অংশ নেওয়ার জন্য দেশিয় পর্যটকের ঢল নামে। এখনও প্রতি সপ্তাহে এই ট্যুর পরিচালনা করা হয়। সেতুর পর জাজিরা ও ভাঙ্গার মতো অনুন্নত এলাকায় সম্প্রতি প্রচুর হোটেল-রেস্তোরাঁ-রিসোর্ট গড়ে উঠছে। যদিও তাতে পরিকল্পনাহীনতার ছাপ স্পষ্ট। কুয়াকাটায় পর্যটকের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। কুয়াকাটায় সুসমন্বিত, পরিবেশবান্ধব পরিকল্পিত পর্যটন অবকাঠামো গড়ে তোলার এখনই সময়।

দেশের প্রতিটি গ্রামকেই পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করা সম্ভব। এ জন্য প্রতিটি এলাকায় উপযুক্ত পর্যটন অবকাঠামো এবং নিরাপদ খাবার ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থাসহ প্রশিক্ষিত ও বিশেষভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত ট্যুর গাইডিং কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হলে অভ্যন্তরীণ পর্যটন ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে। পর্যটন এমন একটি শিল্প যা প্রায় সকল বিষয়ের সাথে যুক্ত। সামগ্রিকভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, পরিবেশ- বান্ধব কাঠামোতে টেকসই পর্যটন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পকে জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান হাতিয়ারে পরিণত করা সম্ভব।

শঙ্খ নদে, রেমাক্রি ঝরনায়

মেঘলা দেখা শেষে আমরা চললাম চিম্বুকের শৈলপ্রপাত দেখতে। অসাধারণ সেই শৈলপ্রপাত। আমাদের মধ্যে কয়েকজন সেই শৈলপ্রপাতে নামবেই। বড় বড় পাথরের মাঝখান দিয়ে বরফগলা পানি বয়ে চলেছে।

শাইনি শিফা
কথাশিল্পী

আমরা ১১ জন। রাতের বাসের টিকিট করা হয়েছিল, চাকরিজীবীরা যাতে কাজ শেষ করে এসেই বাসে চেপে বসতে পারে। আমরাও চড়লাম। হাতব্যাগে ভরে নিলাম টুকটাক খাবার। রওনা দিলাম বান্দরবানের উদ্দেশ্যে।

আমরা বান্দরবানে পৌঁছালাম সকালে। ফ্রেশ হয়ে নাশতা করে আবার বেরিয়ে পড়লাম। বান্দরবান পার হয়ে প্রথমে মেঘলা। তাকিয়ে দেখলাম, মেঘলার আকাশ পরিষ্কার, তবে মেঘ আছে কিছু কিছু জায়গায়। মনে হল, সাদা রং দিয়ে কেউ নীল আকাশে ছোপ ছোপ মেঘ এঁকে রেখেছে। নিচে টলটলে পানির মতো আয়নায়ও দেখা গেল সেই নীল আকাশে সাদা মেঘের ছোপ। মনটাও সাদা তুলোর মতো ফুরফুরে হয়ে উঠলো।

আমরা চলেছি, পাহাড়গুলো হরেক রকমের সবুজ পাতায় ছাওয়া। সবুজেরও কত রকম শেড থাকতে পারে, সেটা দেখে মুগ্ধ হলাম। গাছের পাতা দেখে মনে হলো, এই মাত্র কেউ পানি দিয়ে মুছে দিয়ে গেছে। টলটলে পানির ওপরে টলোমলো সেতু। ঝুলন্ত সেই সেতুতে ঝুল খেয়ে মনে হল যেন পাখির মতো ডানা মেলে দিই।

মেঘলা দেখা শেষে আমরা চললাম চিম্বুকের শৈলপ্রপাত দেখতে। অসাধারণ সেই শৈলপ্রপাত। আমাদের মধ্যে কয়েকজন সেই শৈলপ্রপাতে নামবেই। বড় বড় পাথরের মাঝখান দিয়ে বরফগলা পানি বয়ে চলেছে। পাথর ধরে ধরে এক রকম হামাগুড়ি দিয়ে আমরা চললাম জলপ্রপাতের কাছে। হঠাৎ দেখি, আমার এক দেবর পিছলে পড়ে গেছে। পানির স্রোতে ভেসে চলে যাচ্ছে। দেখে বুকটা ধড়াস করে উঠলো। সে নিজের টাল সামলাতে পারছিল না। এক সময় পাথরের খাঁজে আটকে গেল নিজেই।

এ শৈলপ্রপাতের সৌন্দর্য বেশিক্ষণ আমাদের বেঁধে রাখতে পারলো না। কারণ ২০০৩ সালে একবার আমরা সেখানে

গিয়েছিলাম। আমরা এবার ওপরে উঠে এলাম, মানে পিচঢালা রাস্তায়। সেখানে একটু বিশ্রাম নিতে নিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে তৈরি একটা থামি কিনে ফেললাম। ওদের কাছ থেকেই শিখে নিলাম কীভাবে সেটা পরতে হয়।

আমরা আবার চললাম। প্রথমে নীলগিরি, নীলগিরি পার হয়ে থানচি। দুপাশের পাহাড় ফেলে ফেলে এঁকে বেঁকে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলছিল আমাদের গাড়ি। পাহাড় কেটে যারা পথ তৈরি করেছিল, আমাদের পাহাড়ের চূড়া দেখার সুযোগ করে দিয়েছে, মনে মনে তাদের ধন্যবাদ দিই আমরা।

পাহাড়ের চূড়ায় আরেক পাহাড়, থানচি। যেন অন্য সব পাহাড়কে শাসন করছে সে। মেঘ আর কুয়াশার লুকোচুরি খেলা চলে পাহাড়ের গায়ে। দমকা হাওয়া এসে খেলাটা লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। মেঘেরা আবার আসে, পাহাড়কে ছেড়ে যেতে পারে না। পাহাড়ের সাথে ভাব তার কাটে না। হঠাৎ দেখি, এ কী? কুয়াশা না কি মেঘ? আমি অবাক হয়ে ওদের খেলা দেখি। নাকে এসে লাগে বুনো ঘ্রাণ। সেই মাদকতামাখা ঘ্রাণে যেন মাতাল হয়ে যাই পাহাড়, কুয়াশা আর মেঘেদের সাথে।

থানচি পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা গড়িয়ে আসে। মেঘেরাও ঘুমাতে যায়। পাহাড় কালো হতে থাকে। মন খারাপেরা যেন ভর করে রাত্রি নামে পাহাড়ের কোলে। আমরা থানচির গেস্ট হাউজে উঠি। সেখানেই বনমোরগ, ব্যাম্বু চিকেন, হলুদ ফুল ভাজি আর বাঁশ-কোরল দিয়ে ভাত খাই।

পরদিন সকালে তড়িঘড়ি করে নাশতা করে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ি 'বড়পাথর' আর ঝরনা দেখার লোভে। পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে নিচে এসে দুটো নৌকা নিয়ে নিই আমরা, ছোট ছোট ডিঙি নৌকা। নদীটা মন কেড়ে নেয় আমাদের। এর নাম সাংগু, শঙ্খ নদ। নামটা শুনেই মনে হল খুব আদুরে। শঙ্খ নদ পাথরে ভরা, অল্প-স্বল্প স্বচ্ছ পানি। পাথরগুলো যেন চেয়ে আছে আমাদের দিকে। ছোট, বড়, মাঝারি, কালো, ধূসর, দুধসাদা হরেক রকমের পাথরে ভরা সাংগু। পাথরগুলোকে একটু ছুঁয়ে আদর করে বললাম, 'তোরা থাক, আমরা ঘুরে আসছি।'

পাহাড়ের খাঁজ ধরে টলটলে স্বচ্ছ পানির ওপর দিয়ে ডিঙি নৌকা এগিয়ে যেতে লাগলো। দুপাশে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা ছোট ছরার মতো বয়ে চলেছে শঙ্খ। ঘণ্টাখানেক চলার পর নদীর পাথরগুলো যেন আরও ওপরে উঠে এল। আমাদের ভার সে সইবে কেন? নামতে হলো। নদীর দুই পাড়ে শুধু পাথর আর পাথর। পাথর মাড়িয়ে চলতে থাকি আমরা। কারো আবার দুই পাথরের মাঝখানে পা আটকে যায়, যেন ওরা বলছে, 'এখানেই থেকে যাও।'

কিছুটা পথ বেয়ে টং দোকানের পাহাড়ি কলা আর পেপে খেয়ে আমরা আবার উঠি নৌকায়। 'বড়পাথর'-এ এসে দেখি আসলেই অনেক বড় একটা পাথর। স্থানীয়রা এটাকে পুজা করে। পাথরের গায়ে বলি দেয় বনমোরগ। রক্তও দেখলাম ছোপ ছোপ। মনে হল, সিনেমায় দেখা বনমানুষের বলি দেওয়ার দেশে চলে এসেছি।

বড়পাথর পার হয়ে আরো ঘণ্টাখানেক পর ঝরনার কাছে গিয়ে পৌঁছালাম। ঝরনাটার নাম রেমাক্রিখুম। খুম মানে মারমা ভাষায় জলপ্রপাত। ঝরনাটা ছোট, কিন্তু আবেদন অনেক। ছোট জিনিসের আবেদন সব সময়ই মনে হয় একটু বেশি হয়। নয়তো ভ্রমর, প্রজাপতি বা চন্দনা নিয়ে এত গান বা কবিতা রচনা হতো না, হতো বাজপাখি বা উটপাখি নিয়ে।

ঝরনার কাছে গিয়ে অনেক আনন্দ হলো। বাচ্চারা রেমাক্রিখুমের জলে স্নান করলো। আমি কিছুক্ষণ একটা পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে রইলাম। যেন ওর সৌন্দর্য আঁকড়ে ধরার চেষ্টা। ঠান্ডা পানিতে পা ভেজাতে উদগ্রীব আমরা।

পাথরগুলো বড্ড বেহায়া। একটু এদিক-সেদিক হলেই আমাদের শুইয়ে দিচ্ছে। আমরাও পিছলে গিয়ে হেসে মরে যাচ্ছিলাম। একটু দূরে আমার দেবরের বাচ্চারা সেই পানিতে গোসল করা শুরু করে দিল। আমি কেবল শুয়ে শুয়ে ওদের জলকেলি দেখি, মাথার ওপরে নীল-সাদা মেঘেদের লুকোচুরি খেলা দেখি। এত সৌন্দর্য আমি একসঙ্গে উপভোগ করতে পারি না যেন।

রেমাক্রিখুমের পরে আরও তিন ঘণ্টা পায়ে হাঁটার পর পাওয়া যেত নাফাখুম ঝরনা, যেটা কি না পাঁচ স্তরে বেয়ে গিয়ে ২৫-৩০ ফুট নিচে গিয়ে পড়েছে। নাফাখুমকে অনেকে বলেন বাংলাদেশের নায়াগ্রা। সেখানে যাওয়ার আর সময় পেলাম না আমরা।

রেমাক্রি আমাকে বাকি দুটো দিন আচ্ছন্ন করে রাখলো। যেখানে যাচ্ছি, যাই খাচ্ছি, রেমাক্রির সৌন্দর্য মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না। তারপর রেমাক্রিকে পেছনে ফেলে শঙ্খ নদ আর পাহাড়ের সবটুকু সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে থানচি বিজিবি রিসোর্টে পৌঁছাই। এখানে এসে দেখি, যে কটেজে উঠেছি, সেটার নামও রেমাক্রি। রাতে রেমাক্রির কোলেই ঘুমিয়ে পড়ি।

Photo Credit: Raw Hasan

পর্যটনবিষয়ক গবেষণা: মিথ যেভাবে পর্যটনকে সমৃদ্ধ করে

মেলার মূল আকর্ষণ হলো অতিকায় মাছের পসরা। বড় মাছের মধ্যে বাগাড়, আইড়, বোয়াল, চিতল, রুই, পাঙ্গাস, কাতল ও সুরমা মাছ পাওয়া যায়। মেলার আরেকটি আকর্ষণ মিষ্টির বাহার। নানা আকার ও পদ্ধতিতে তৈরি করা মিষ্টি খেতে হাজির হয়ে যায় সব বয়সী মানুষ।

আমির খসরু সেলিম
নির্বাহী সম্পাদক, পর্যটন বিচিত্রা

দেশের বেশিরভাগ পর্যটনস্থান ঘিরে রয়েছে নানা কাহিনি। এগুলো সচরাচর মানুষের মুখে-মুখে ঘোরে। মূল গল্পের সাথে কথক আরও কিছু মনগড়া তথ্য জুড়ে দেন। ফলে সেটা সত্য-মিথ্যা যাই হোক, আকর্ষণীয় শোনায়।

যেসব পর্যটনস্থানকে ঘিরে এ ধরণের মিথ ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে ইতিহাস সন্ধানীদের কৌতুহলের তীব্রতা বাড়ে। রহস্যময় কিংবা রোমহর্ষক গল্পগুলি কল্পনা করে পর্যটক উত্তেজনা বোধ করেন। অনেক সময় তথ্য যাচাই করতে নিজেই হাজির হয়ে যান সেখানে। সব মিলিয়ে দেখা যায়, নানাভাবে মিথগুলি পর্যটনকে সমৃদ্ধ করে। এ রকম এক মিথের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

'ওইখানে এক বিল আছিল', আঙুল উঁচিয়ে পূর্ব দিকে নির্দেশ করেন জাবেদ আলি। নব্বইয়ের কোঠায় বয়স। দীর্ঘজীবন কৃষিকাজ করে শরীর তার এখনও সক্ষম। পোড়াদহের মেলায় এসে তার মুখে 'পুড়ে যাওয়া গর্তের' গল্প শুনছি। বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষায় 'দহ' মানে গভীর গর্ত। আশা ছিল, পোড়াদহের মেলা নিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ কোনো গল্প পাব। কিন্তু জাবেদ আলী যে গল্প শোনালেন তা রূপকথাকেও হার মানায়।

প্রায় দুইশ বছর আগের কথা। খুব খরা হয়েছিল। খরার ধরন দেখে মানুষ আধাপাকা ফসল কেটে এনে ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। গরমে বিলের পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। বিশ-পঁচিশ হাত গভীর বিলের সব পানি শুকিয়ে গেল আশ্চর্যজনকভাবে! তার চেয়ে আজব ঘটনা, বিলের নিচে দেখা মিলল আরো গভীর এক গর্তের। বিশাল একটা ভারি

বল যেন মহাকাশ (জাবেদ আলীর ভাষায় 'আসমান) থেকে মাটিতে আছড়ে পড়েছিল। তাতে বৃত্তের মতো গর্ত দেখা দেয় বিলের গহ্বরে। পানি আরো শুকিয়ে গেলে দেখা গেল গর্তের দেয়ালের মাটির রঙ কুচকুচে কালো, যেন প্রচণ্ড তাপে পুড়ে গিয়েছিল কখনও। সাহসী অনেক মানুষ সেই গর্তের পানিতে নেমে পড়ে। দেখা যায়, বিলের তলদেশ থেকে সেটার গভীরতা আরো হাত পনেরো হবে। বিচিত্র কিছু আবিষ্কারের আশায় যারা 'পোড়াদহে' নেমেছিল, তারা বিশেষ কিছু পেল না। তবে বিশাল আকৃতির মাছের অস্তিত্ব টের পেল। গর্তটার আয়তন হবে চার বিঘার মতো। চার গ্রামের সব জেলে মিলে পুরোটা সেচে ফেলল। ধরা পড়ল অসংখ্য মাছ। মাছগুলোর আকার দেখার মতোই। গর্তের পাশেই মাছের মেলা শুরু হয়ে গেল। অতিকায় মাছ দেখতে এবং কিনতে জড়ো হলেন দূর-দূরান্তের মানুষ। সেখান থেকেই শুরু হয় 'পোড়াদহের' মেলা।

এই মেলা এখন অতিকায় আকার ধারণ করেছে। প্রতিবছর এই মেলাকে ঘিরে আরেক গ্রামীণ সংস্কৃতি ও আচার-আয়োজন শুরু হয়। সেটাকে বলে 'বউ' মেলা। পুরো আয়োজনে অংশ নেওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয় গ্রামের জামাই ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে। মেলা থেকে বড় আকারের মাছ, মিষ্টি, মশলা ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় মানুষদের ভাষায়, 'মেলার মধ্যি জামাই-বেটিক না আনলে মেলাই হবিনে।' স্থানীয় মানুষদের কাছে এ মেলার গুরুত্ব অনেক। সারা বছর ধরে এর আয়োজন চলে। আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ে গ্রামগুলো গমগম করে। বলা হয়ে থাকে, এই ঐতিহ্য চলে আসছে সাড়ে চারশ বছর ধরে। প্রতি বাংলা সনের মাঘ মাসের শেষ বুধবারে এক দিনের এ মেলা বসলেও এর জের থাকে তিন দিন। প্রথম দিন মূল মেলা, পরের দিন বৃহস্পতিবার বসে 'বউমেলা'। মেলার মূল আকর্ষণ হলো অতিকায় মাছের পসরা। বড় মাছের মধ্যে বাগাড়, আইড়, বোয়াল, চিতল, রুই, পাঙ্গাস, কাতল ও সুরমা মাছ পাওয়া যায়। আগে শুধু নদীর মাছ আসতো। এখন তার সাথে যুক্ত হয়েছে চাষের মাছ। মেলার আরেকটি আকর্ষণ মিষ্টির বাহার। ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি করা নানা আকারের এসব মিষ্টি খেতে হাজির হন প্রায় সব বয়সী মানুষ। মেলায় পাওয়া যায় কাঠের ফার্নিচার, মশলা, বড়ই, পান-সুপারিসহ নানা প্রয়োজনীয় জিনিস।

পোড়াদহ মেলা আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্যের অংশ হয়ে গেছে। কিন্তু একে ঘিরে যে কিংবদন্তি সেটাও বিচিত্র। কে জানে আসলে কী ঘটেছিল সেই 'পোড়াদহের' ভাগ্যে! কালের আড়ালে সত্যিকারের গল্পটি হয়তো অজানাই রয়ে যাবে।

এ রকম হাজারো গল্পে ঠাসা আমাদের সংস্কৃতির আঙ্গিনা। এসব গল্প কালের চাকার সাথে ঘুরতে গিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করছে, সমৃদ্ধ করছে পর্যটনকে। আরেকটি মিথের কাহিনি বলি।

হান্নান মণ্ডলের চোখটা ঘোলাটে দেখায়। প্রাচীন এক উপকথার গল্প বলতে গিয়ে নিজেই হারিয়ে যান ইতিহাসের পাতায়। আশেপাশের পরিবেশ আর গল্পের গাঁথুনি একটানে অতীতকে সামনে নিয়ে আসে। ফসকে যাওয়া গল্পের হালকে আবার শক্ত করে ধরেন হান্নান মণ্ডল। বলে যান সেই কিংবদন্তির উপাখ্যান, 'তারপর কি যেন বলতেছিলাম বাবা..., সুলতান সাহেব সেই সুদূর বলখ নগর থেইকে এই বঙ্গদেশে আসলেন। তার পিরানের ভিতর পোটলায় বাঁধা সামান্য একটু লাল রঙের মাটি। খোদার আদেশ হইছে, যেইখানে এই রকম মাটির মিল পাবা সেইখানে তুমি ধর্মকর্ম করবা। তারপর এক নিশি রাইতে সুলতান সাহেব এই করতোয়া নদীর পাড়ে আইসা দাঁড়াইলেন। এই যে এখন করতোয়া দেখতাছেন ড্রেরে-নর মতোন, তখনকার করতোয়ায় আছিল বিরাট ঢেউ। বড় গাঙ থেইকা বাণিজ্যের নাও আইসা ভিড়তো এই মহাস্থানগড়ে। তো সুলতান সাহেব আইসা দেখলেন নদী পারাপারের কোনো ব্যবস্থা নাই। সুলতান সাহেব খোদার কাছে আর্জি দিলেন। বিরাট এক মাছ আইসা কইলো, হুজুর আমার পিঠে উঠেন। আমি নদী পার কইরা দিতাছি। তখন সুলতান সাহেব মাছের পিঠে চইড়া নদী পার হইলেন। তখন থেইকা তার নামের সাথে বলা হয় 'মাহী-সওয়ার' বা মাছের পিঠে আরোহণকারী।

প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত আড়াই হাজার বছরের পুরনো সভ্যতা মহাস্থানগড়। এর আদি নাম পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধননগর। বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম শাসনে কেটেছে এই নগরের জীবনকাল। ফলে নানা সংস্কৃতির নমুনা খুঁজে পাওয়া যায় এখানে। চীন থেকে এখানে এসেছিলেন পর্যটক, ধর্মগ্রন্থ সংগ্রাহক হিউয়েন সাঙ। শোনা যায় মহামতি গৌতম বুদ্ধও এসেছিলেন এদিকে। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সময় ফকির মজনু শাহ্‌ও এখানে আস্তানা গেড়েছিলেন। কালের আবর্তনে গল্পগাঁথা আর কিংবদন্তির ভিড় জমেছে এই অঞ্চলকে ঘিরে।

দরবেশ হান্নান মণ্ডল মহাস্থানগড়ে এসেছেন পূণ্যভূমিতে। এখানে আছে ইসলাম ধর্ম প্রচারক হযরত শাহ্ সুলতান বলখী (রঃ) মাহীসওয়ার-এর মাজার। হান্নান মণ্ডল আবার বলতে শুরু করেন, 'সুলতান সাহেবের এই আজিব কাণ্ড দেইখা নগরীর দারোয়ান সদর দরজা খুইলা দিলো। নিরাপত্তার জন্য নদীতে খেয়া রাখা হয় নাই। হুজুর পার হইলেন মাছের পিঠে চইড়া। এই সংবাদও তখনই গেল রাজা পরশুরামের কানে। রাজা সব শুইনা কয়, ফকির কি চায়? ফকির চায় শুধু জায়নামাজ বিছানোর জায়গা। ফজরের নামাজ পড়বে। রাজা সম্মতি দিলেন। সুলতান বাবার কি কেরামত! ফজরের ওয়াক্তে সবাই দেখে, সেই

জায়নামাজ সারা নগরী বিছাইয়া গেছে। কোথাও পা ফেলনের জায়গা নাই। বিষয় দেইখা রাজা পরশুরামের কইলজা নইড়া গেল। এরপর শুরু হইলো দুষ্ট রাজা পরশুরাম আর সুলতান সাহেবের যুদ্ধ। বনের বাঘ আইসাও সুলতান সাহেবরে সঙ্গ দিলো। খোদার ইচ্ছায় নিপাত গেল রাজা।

ইতিহাস, ঐতিহ্য আর কিংবদন্তি মিলেমিশে একাকার এসব পর্যটনস্পটগুলির সৌন্দর্য শুধু বাড়িয়েই চলছে। ফুলের যেমন নানা রঙ হয়, তেমনি মিথগুলোও পর্যটনে বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। এগুলোর আবেদন অনেক। এখনকার মানুষ শুধু বেড়ানোর জন্য বেড়ায় না। তারা এর মাধ্যমে মনের চোখ খুলে নিতে চায়। জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে চায়। এর সঙ্গে যদি 'থ্রিল' যুক্ত হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

আরেকটি জনপ্রিয় মিথের সাথে পরিচয় করিয়ে লেখাটির ইতি টানছি।

মহারাজ প্রাণনাথ স্বপ্ন দেখছেন। তার চোখের পাতা কাঁপছে। সারা শরীর ঘামে ভিজে একাকার। ঘুমের মধ্যেই মহারাজ গোঙানির মতো শব্দ করলেন। শব্দ শুনে রুক্মিনী দেবী চমকে জেগে উঠলেন। প্রথমেই স্বামীর দিকে চোখ পড়ল তার। মায়া হল মহারাজের অবস্থা দেখে। দিনাজপুর নামের বিরাট এক অঞ্চলের প্রতাপশালী মহারাজা ঘুমের ঘোরে শিশুর মতো কাঁদছেন। রানি আস্তে করে স্বামীর গায়ে হাত দিলেন। স্পর্শের আশ্বাসে স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলেন রাজা। চোখে মেলে তাকাতেই রানি বললেন, উঠো না। বিশ্রাম নাও।

পরদিন সকালেই রানি ডেকে পাঠালেন রাজ্যের প্রধান চিকিৎসককে। চিকিৎসক রাজাকে ভালো করে দেখে বললেন, দুশ্চিন্তার কারণে স্নায়বিক দুর্বলতা এবং সেখান থেকে শারীরিক অচলতা দেখা দিয়েছে। কালীবাড়ির প্রধান তান্ত্রিককেও রানি খবর পাঠালেন। তিনি এসে নানা রকম পূজা-পাঠের পর জানালেন, মহারাজের ওপর দেবতারা ভর করেছে। দেবতারা মহারাজের মাধ্যমে এমন কিছু করাতে চান যা তাকে চির স্মরণীয় করে রাখবে। শারীরিক দুর্বলতা যথা সময়ে কেটে যাবে। চিন্তার কিছু নেই।

এদিকে মহারাজের ঘোরলাগা অবস্থা আরো বেড়ে গেল। বেশিরভাগ সময় ঘরে থাকেন। সহজে বের হন না। রাজ্যের শাসনব্যবস্থা রানিকেই কাঁধে তুলে নিতে হল। বিচক্ষণ মন্ত্রীদের সাহায্যে টিকে রইল রাজ্য। মহারাজ প্রাণনাথের দত্তকপুত্র রামনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রানি রুক্মিনী দেবী পুরো পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। এক সন্ধ্যায় মহারাজ প্রাণনাথ রানিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, দেবতারা আমাকে এক মহান কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। অনন্য এক মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা। আজ রাতেই এই মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত করতে হবে। রানি ভাবলেন, রোগের ঘোরে ভুল বকছেন রাজা। বিশেষ করে স্বপ্নের মন্দিরের যে বর্ণনা মহারাজ দিলেন, সে রকম মন্দির তৈরি করতে কয়েক বছর লেগে যাবে। রানির সঙ্গে কথা বলে প্রার্থনা করতে বসলেন মহারাজ। মাঝরাতে স্বর্গ থেকে নেমে এলো দেবশিল্পীরা। দেখতে দেখতে ভোর হওয়ার আগেই তৈরি হয়ে গেল সেই অপূর্ব মন্দির!

মন্দির নিয়ে দিনাজপুরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে এই রকম জনশ্রুতি। সৌন্দর্যের দিক দিয়ে সেখানকার কান্তজীর মন্দির অনবদ্য। পোড়ামাটির ফলকচিত্র দিয়ে সাজানো এ রকম মন্দির দেশের আর কোথাও নেই। জনশ্রুতি যা-ই থাকুক, মহারাজ প্রাণনাথ এর নির্মাণকাজ শুরু করেন ১৭২২ সালে। তার জীবদ্দশায় মন্দির নির্মাণ শেষ করা সম্ভব হয়নি। তার দত্তকপুত্র মহারাজ রামনাথ এটি সম্পন্ন করেন ১৭৫২ সালে। বর্তমানে মন্দিরের যে আদল, শুরুতে এটি তার চেয়েও চিত্তাকর্ষক ছিল। ১৮৯৭ সালে এক ভূমিকম্পে মন্দিরটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। তার কয়েক বছর পর মহারাজা গিরিজানাথ বাহাদুর এর ব্যাপক সংস্কার করেন। এরপরেও মন্দিরচত্বরে কিছু সংস্কার কাজ হয়েছে।

কান্তজীর মন্দিরের অবস্থান দিনাজপুর জেলা সদর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার উত্তরে, কান্তনগর গ্রামের ঢেপা নদীর পাড়ে। এর প্রধান আকর্ষণ পুরো মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির চিত্রিত ফলক। লালচে সেসব পোড়ামাটির ফলকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের মতো পৌরাণিক কাহিনির চিত্র। মৃৎশিল্প হিসেবে এগুলির আবেদন ও নির্মাণশৈলী অনন্য। দেশের সবচেয়ে সুন্দর টেরাকোটার নিদর্শন রয়েছে এখানেই। মূল মন্দিরটি দেখতে একটা বিশাল রথের মতো। ধাপে ধাপে এর চূড়া ওপর দিকে উঠে গেছে। মন্দিরের চারদিকে খোলা জায়গা রয়েছে।

বিচিত্র জনশ্রুতি আর অলঙ্করণসমৃদ্ধ বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর এই মন্দিরটি দেখার আমন্ত্রণ সবাইকে।

Photo Credit: isshh.com

স্মার্ট পর্যটন
স্মার্ট বাংলাদেশের অঙ্গীকার!

পারভেজ আহমেদ চৌধুরী
সাবেক মহা-ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

পাখির ডানায় উড়ে
জাতির পিতার অধ্যাদেশে-
দিগন্ত আলো করে
এলো পর্যটন, স্বাধীন বাংলাদেশে।
যাত্রা শুরুর তিয়াত্তরে, সাজলো পর্যটন নতুন করে-
নতুন দেশের নতুন ভাবনা নিয়ে;
বিশ্ব দেখলো তাদের চোখে-
লাল সবুজের রঙ মেখে,
জেগেছে এক দেশ স্বাধীন পরিচয়ে।
দেশি-বিদেশি পর্যটকের সেবায়,
হোটেল মোটেল প্রশিক্ষণ ট্যুরের ঘটায়-
ব্যস্ত এক পথিকৃত প্রতিষ্ঠান-
জন্ম দিলো পেশাজীবী কর্মীদল,
তারুণ্যে উদ্দীপ্ত এগিয়ে যাওয়াই বল-
পর্যটন করপোরেশন বাংলাদেশের প্রাণ।
ইউরোপ রাশিয়া আমেরিকা থেকে-
পর্যটকের দল এলো, বিস্মিত দেশকে দেখে,
সবার কাছে পৌঁছে দেয়া বারতা সবুজের-
নিয়ে এলো আকর্ষণ অফুরান সাজের,
দীর্ঘতম সাগরতট, সুন্দরবনের গর্জন বেঙ্গল টাইগারের,
রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান আর সিলেটের হাওরের।
দেশ দেখানোর গৌরবে গর্বিত হলো সবাই-
দিন-রাত্রি কাজকর্মে কোন ক্লান্তি নাই,
দেশকে প্রতিষ্ঠা করা চাই সবার উপরে-
পর্যটকদের নিরাপদ গন্তব্য গড়তে-
দেশের সুনাম, দেশকে এগিয়ে নিতে,
পর্যটন হলো পথিকৃত উত্তরণের শিখরে।
কোথায় খুঁজে পাবে এমন প্রতিষ্ঠান-
উজ্জীবিত, ধাবিত নদীর মত বহমান,
স্বপ্ন বাস্তবায়নে গড়তে "স্মার্ট বাংলাদেশ"-
পর্যটন করপোরেশন সদা আগুয়ান,
প্রতিটি ইউনিটে সফলতার ছোঁয়া দৃশ্যমান,
দক্ষ নেতৃত্বে অঙ্গীকার, স্মার্ট পর্যটন গড়বে স্মার্ট স্বদেশ।

Photo Credit: wikipedia

রাঙ্গামাটির বুকে

আখতারুল ইসলাম, চট্টগ্রাম

আঁকাবাঁকা মেঠোপথ ছুটে যায় দূরে
সবুজের পাতাবন গান গায় সুরে।
আকাশের নীল জরি পাহাড়ের গায়ে
জল ছুঁয়ে ঢেউ খেলে রোদ্দুর নায়ে।
হেলে দুলে গাছেরাও মার্চ-পিটি করে
মেতে ওঠে কোলাহল দূর মাচাঘরে।
শনপাতা ঝনঝন পাখিদের গানে
বনফুল অপরূপ চোখ দুটো টানে।

ঝরনার রিনিঝিনি কোথা ছুটে চলে
বুনোহাঁস ভেলাবাঁধে থই থই জলে।
রঙধনু করে খেলা পড়ে নীল শাড়ি
লেক জুড়ে টিলা চড়ে কত ঘরবাড়ি।
পাহাড়ের ঝুমডালে মানুষের কাজে
সূর্যের রাঙা আলো অনাবিল সাজে।
সারি সারি তালপাতা যেন হাতপাখা
কোনো এক শিল্পীর রঙচঙে আঁকা।

রোদ ওড়ে ঘুরে ঘুরে করে চিক চিক
নীলটুনি মাছরাঙা মন কাড়ে ঠিক।
খরগোশ লেজ তুলে ছোটে ঘাসবনে
শেয়ালের ডাক আসে সেই ক্ষণে ক্ষণে।

ফুলে ফলে ছেয়ে আছে পাহাড়ের বাঁক
তুলতুলে মেঘপরি পাখিদের ঝাঁক।
বাতাসের দোল খেয়ে মন দেয় নাড়া
জোছনার আলো ঝরে জেগে ওঠে পাড়া।

বৃষ্টির রিমঝিম সুরে সুরে গান
শীত এলে ঝরাপাতা কুড়মুড়ে টান।
কাশবনে ঘাসফুল বলে কত কথা
লতাপাতা নড়েচড়ে খোঁজে স্বাধীনতা।
শিশিরের ভেজাপথ সুকোমল মাটি
শিরিষের পাতাছায়া ওড়ে পরিপাটি।
ফড়িংও প্রজাপতি রঙরূপে আঁকা
স্বপ্নেরা কথা বলে যায় ধরে রাখা।

সবুজের কোল জুড়ে জোনাকির মেলা
তারপাশে মাথা রেখে কেটে যায় বেলা।
কারো মাঝে ভেদাভেদ নেই কোনো খানে
স্বর্গটা নেমে আসে মানুষের প্রাণে।
প্রকৃতির উৎসব চলে বারো মাস
সাদাসিধে জীবনের সুখে বসবাস।
এ আমার রাঙামাটি প্রিয় তার মুখ
পাহাড়ের ডালে ডালে অনাবিল সুখ।

Photo Credit: Zenger News

বাংলাদেশকে দেখা

মুস্তাফা হাবীব, বরিশাল

ছোট্ট একটি পর্ণকুটির আছে শ্যামল গাঁয়ে,
কিশোরবেলা যাচ্ছে কেটে চড়ে পানসি নায়ে।
মাঠের ধারে বাও বাতাসে উড়াই রঙিন ঘুড়ি,
আপন ধ্যানে কাব্য গানে খুঁজি মায়ার পুরী।

ইচ্ছে আমার দেখবো আমি স্বর্ণকমল নদী,
কোথা থেকে জলের ধারা আসছে নিরবধি !
যাব আবার ছন্দ সুরে উড়ালপঙ্খী শিপে,
সাগর পাহাড় কোকাব শহর এবং নিঝুম দ্বীপে।

রবি'র বাড়ি, লালন আখড়া আরও টুঙ্গিপাড়া,
দু'চোখ ভরে দেখবো আমি বাংলাদেশের দাঁড়া।
অজানাকে জানতে চেয়ে মেলবো ডানা একা,
সার্থক জনম হয় যদি গো বাংলাদেশকে দেখা।

Photo Credit: lostwithpurpose.com

পর্যটনক্ষেত্রে নারীর সুবিধা-অসুবিধা

পারিবারিকভাবে হোক, বন্ধুদের সঙ্গে কিংবা সমাজকর্মে, অফিসিয়াল কাজেও নারীকে ঘর থেকে বের হয়েও পর্যটনের স্বাদ গ্রহণ করতে দেখা গেছে। ফলে নারীর নিরাপত্তা সমাজের আর সবার নিরাপত্তার সঙ্গেই সম্পৃক্ত।

আফরিনা রহমান ফ্লোরা
সহকারী শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যুগে যুগে ভ্রমণকারীরা মুগ্ধ হয়েছেন। সৌন্দর্যের এ লীলাভূমিতে পর্যটনশিল্প উন্নয়নের সম্ভাবনা অপরিসীম। বাংলাদেশের যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত অসুবিধা ছাড়াও নিরাপত্তা নিয়ে পর্যটকেরা উদ্বিগ্ন থাকেন। বিভিন্ন পর্যটনস্পটে পর্যটকেরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিশেষত নারী ও বিদেশি পর্যটকেরা এসব সমস্যায় বেশি পড়েন।

সম্প্রতি বাংলাদেশে সলো ট্রাভেলিংয়ের ট্রেন্ড চালু হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নারীরাও পিছিয়ে নেই। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য ঘুরে দেখতে চান তারাও। কিংবা কাজের ফাঁকে কিছু সময় নিজের মতো করে কাটাতে চান। এ জন্য কখনও একা, কখনও দলবেঁধে দেশের বিভিন্ন পর্যটনস্পটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নারীরা। পর্যটনের অপার সম্ভাবনায় নারীর এই অগ্রযাত্রা সামাজিক ও আর্থিকভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

পিছিয়ে পড়া নারী যখন সব বাধা ডিঙিয়ে একাই ঘর থেকে বেরোতে চান, তখন এটি স্পষ্ট যে, পর্যটনে নারীরাও উৎসাহী হচ্ছেন। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কারণেই নারীরা এখন বেরিয়ে পড়তে চান, নিজের মতো করে, পছন্দের জায়গায় ঘুরতে যেতে চান। পারিবারিক-ভাবে হোক, বন্ধুদের সঙ্গে কিংবা সমাজকর্মে, অফিসিয়াল কাজেও নারীকে ঘর থেকে বের হয়ে পর্যটনের স্বাদ গ্রহণ করতে দেখা গেছে। ফলে নারীর নিরাপত্তা সমাজের আর সবার নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নারীর জন্য আলাদা নিরাপত্তার কথা হয়তো এখন আর কেউ সেভাবে ভাবছে না। আলোচনায় এসেছে, নারীর নিশ্চিত নিরাপত্তা।

সেটা কতটুকু জোরদার হয়েছে আমাদের পর্যটন এলাকাগুলোতে? নারীদের জন্য বিনোদন, বিশ্রাম কিংবা অবসরের জন্য নিরাপদ ভ্রমণ এখন সময়ের দাবি। কোলাহল থেকে দূরে, ছুটির সময়ে যদি নিজেকে ভিন্নভাবে আবিষ্কার করা যায়, প্রকৃতির মাঝে বিলীন হয়ে প্রফুল্লচিত্তে ঘরে ফিরতে পারে, তবে সেটা শুধু পরিবার নয়, জাতীয় অর্থনীতির জন্যও সুখকর এবং ইতিবাচক ফল বয়ে আনে। ভ্রমণ জগতে নারীর অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করা গেলে বিদেশি নারী পর্যটকেরাও একা এদেশে আসতে আরও বেশি আগ্রহী হবেন। বিদেশিদের ভ্রমণে আস্থা অর্জন করতে পারলে শক্তিশালী হবে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। শুধু কী তাই, বেকারত্বের এই দেশে কর্মসংস্থানও অনেক বেড়ে যাবে। ডাবল ডিজিট প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য শুধু এই এক পর্যটন নির্ভরতাই যথেষ্ট।

পর্যটন স্পটগুলোকে আরও বেশি নারীবান্ধব করতে পৃথক বিশ্রামাঘার, গোসল শেষে কাপড় বদলানোর জন্য ঘর, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, ট্যুরিস্ট পুলিশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নারী সদস্যসহ পর্যটন খাতের অন্য সেবাগুলোয় বেশিসংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ জরুরি। কেননা নারীরা এখনো নারীর কাছেই নিজেকে নিরাপদ মনে করে। তাছাড়া অনেক সমস্যার কথাও বলতে পারে, যা পুরুষের কাছে বলা সম্ভব নয়। এক কথায় নারীর জন্য নিরাপদ ও যথাযথ পর্যটনসেবার গুরুত্ব মাথায় রেখে জনপ্রিয় টুরিস্ট স্পটগুলোতে স্থানীয় মানুষের আচরণ সহনশীল হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমণের ক্ষেত্রে নারীদের পুরুষতান্ত্রিক ইগোর স্বীকার হতে হয়। মেয়েদের অবাধ বিচরণ এখনো সমাজের কাছে বেশ দৃষ্টিকটু। আমাদের এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে নারীকে নারী না ভেবে একজন পর্যটক হিসেবেই দেখতে হবে।

এটি শুধু পর্যটনের জন্যই নয়, সার্বিক অর্থনীতি ও বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যখন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা জানবেন এদেশে একজন নারী একা ভ্রমণ করতে পারেন, তারা ভাববেন, দেশটি বেশ নিরাপদ এবং বিনিয়োগের জন্য উত্তম। আর এই প্রক্রিয়ায় আমরা উন্নত দেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে পাড়ি দিতে সক্ষম হবো।

ভ্রমণপিপাসু মানুষ সুযোগ পেলেই ঘুরতে যেতে চায়। কখনো পাহাড়ে, কখনো সাগরে ঘুরে বেড়িয়েই শান্তি পান অনেকে। আবার এমনও আছে, যারা ক্লান্তি দূর করতে একটু রিলাক্স হতে ঘুরতে যান। এই পর্যটকদের মধ্যে যেমন পুরুষ থাকেন, তেমনি নারীরাও থাকেন। একজন নারী পর্যটকের ভ্রমণে যেমন স্বস্তি রয়েছে, ঠিক সেভাবেই অস্বস্তিও রয়েছে। তাই বলে নারীরা ভ্রমণ করা বন্ধ করে দেবে? না। সব পরিস্থিতি ছাপিয়েই নারীরা ঘুরতে যান। একটু মানসিক প্রশান্তির জন্যই তাদের ঘুরতে যাওয়া। যদি নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগেন নারী, তাহলে তার ভ্রমণ যেমন আনন্দের হবে, তেমনি আরও বেশি ভ্রমণে উৎসাহ পাবেন।

একজন নারী পর্যটক হিসেবে সবচেয়ে বেশি যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা হলো তারা যার বা যাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, তারা কতটা সহযোগিতা করবেন। সহযোগিতা-সম্পন্ন মানুষের সঙ্গে গেলে নারীরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন এবং ঘুরতেও পারেন নিশ্চিন্তে।

নারী পর্যটকের সঙ্গে কোনো নারী না থাকলে তাকে অনেক কথা শুনতে হয়। শুধু কথা নয়, একজন নারী আরেকজন নারীকে যত সহজে সুবিধা-অসুবিধার কথা বলতে পারবেন, তা হয়তো তার সঙ্গে থাকা পুরুষ সদস্যকে বলতে পারেন না। নারী একা সমুদ্রে নামলে তাকে আশে-পাশের মানুষ নানাভাবে বিরক্ত করার চেষ্টা করে। সমুদ্রস্নান কিংবা একটু উদাস দৃষ্টিতে সমুদ্রবিলাসের ক্ষেত্রে তাকে অস্বস্তিকর দৃষ্টিসীমায় নিবদ্ধ হতে হয়। কিন্তু এই নারীই যখন তার গ্রুপের সঙ্গে থাকে, বা তার সঙ্গে কোনো নারী থাকে তখন তাকে কেউ কিছু বলতে পারে না।

নারীর থাকার জায়গা নিয়েও অনেক সময় পড়তে হয় অস্বস্তিতে। পর্যটনকেন্দ্রের আবাসিক হোটেলগুলোতে প্রতিদিন কেউ না কেউ থাকে। তাই সেখানকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঠিক মতো হয় না। ঘরে ময়লা জমে থাকে। আবার কখনও কখনও তো হোটেলগুলোতে রুম পাওয়াও দায় হয়ে যায়। একজন নারীর ঘুরতে যাওয়া, থাকা, ঘোরা ও ফেরত আসা নিয়ে সবসময় চিন্তিত থাকতে হয়। অনেক সময় পরিবার থেকে ঘুরতে যাওয়ার অনুমতি নিয়েও বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। ঘুরতে গিয়ে নারীর পোশাক নিয়ে কথা বলছে এমন মানুষেরও সম্মুখীন হতে হয়। তাই নারীর ভ্রমণে স্বস্তি-অস্বস্তি উভয়ই দেখা যায়।

ট্যুরিস্ট পুলিশ বলছে, নারীর নিরাপত্তায় দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত ট্যুরিস্ট পুলিশ সদস্যরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। নারী এখন সব বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। পুরুষের মতো তারাও বেরিয়ে পড়তে চান তাদের পছন্দের জায়গায়। নারীদের হোটেল ভাড়া দেওয়া থেকে শুরু করে, নিজের মতো ভ্রমণের নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে যথোপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে। পর্যটন এলাকাগুলোকে আরও বেশি নারীবান্ধব করতে পৃথক ও পরিচ্ছন্ন বিশ্রামাগার এবং নিরাপত্তার উদ্যোগ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পর্যটনে অধিকসংখ্যক নারীকর্মী নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের মানসিকতার যেমন পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন, তেমনি সরকারের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলেই আমাদের পর্যটন স্পটগুলো হয়ে উঠবে নারীদের ভ্রমণের নিরাপদ ভূমি।

Photo Source: Writer

ভ্রমণ পিপাসুদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে মিরসরাইয়ের পর্যটনস্পটগুলো

চট্টগ্রামের মিরসরাই বাংলাদেশের একমাত্র উপজেলা, বহুমূখী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে এর পশ্চিম উপকূল অংশে জেগে ওঠা চরে পত্তন হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তম অর্থনৈতিক এলাকা 'বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর', যার আয়তন ৩৫ হাজার একর।

এম আনোয়ার হোসেন

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি, *দৈনিক পূর্বদেশ* ও *দ্য ডেইলি বাংলাদেশ টুডে*

পূর্বে সারি সারি সবুজ পাহাড়, পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। যেন পাহাড়ের বুকে মাথা রেখে সাগরে পা ভিজিয়ে শুয়ে আছে পর্যটনের জন্য বিখ্যাত মিরসরাই। দেশের লাইফলাইন-খ্যাত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক তারই বুক চিরে বয়ে গেছে। বলা যায়, একসাথে এতগুলো প্রাকৃতিক পর্যটন স্পট চট্টগ্রাম জেলার আর কোথাও নেই। মিরসরাই প্রতিনিয়তই ভ্রমণ পিপাসুদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এবার তুলে ধরা যাক মিরসরাইয়ের পর্যটন স্পটগুলো।

মহামায়া লেক: ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিরসরাই উপজেলার ঠাকুরদীঘি বাজার থেকে পূর্বে বয়ে যাওয়া ছায়াঘেরা সড়ক। সেই সড়ক ধরে কিছুদূর গেলে দেখা যাবে রেললাইন। রেললাইন পেরুলেই কাছে টানবে মহামায়া। দূর থেকে দেখা যায় পাহাড়সম বাঁধ। উভয় পাশে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। বাঁধের ধারে অপেক্ষমান সারি সারি ডিঙি নৌকা, ইঞ্জিনচালিত বোট আর কায়াকিং বোট।

১১ বর্গকিলোমিটার আয়তনের লেক কেবল শোভা ছড়ায়। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে স্বচ্ছ পানিতে তাকাতেই দেখা যায় নীলাকাশ। পূর্ব-দিগন্তের সারি পাহাড়ের বুক চিরে যেতে যেতে একসময় হারিয়ে যেতেও মন চাইবে কল্পনায়।

কিছু দূরেই দেখা যাবে অঝোরে কাঁদছে পাহাড়। পাহাড়ের কান্নার সেই জলে গা ভাসাতে মন চাইবে। তারও পূর্বে যেখানে লেকের শেষ প্রান্ত, সেখানেও বইছে ঝরনাধারা। কি নীল, কি সবুজ, সব রঙ যেন ঢেলে দেওয়া হয়েছে মহামায়ার প্রকৃতিতে। এর সঙ্গে মিশতে গিয়ে মন এতটাই বদলে যাবে, যেন মন বারবার ঘুরে আসতে চাইবে ফেলে আসা স্মৃতিতে।

খৈয়াছড়া ঝরনা: ভ্রমণপ্রেমীদের কাছে ঝরনার রানি হিসেবে পরিচিত এই এলাকার সবচেয়ে সুন্দর ঝরনা হল খৈয়াছড়া। একে একে নয়টি বড় ধাপে এ জলপ্রপাত থেকে অনবরত ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়। এ ছাড়া ছোট আরো অনেক গুলো ধাপ আছে এ জলপ্রপাতে। সারা বছর এগুলোতে পানির প্রবাহ থাকলেও বর্ষা ও বর্ষা পরবর্তী সময়ে পানি বেশি থাকে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিরসরাইয়ের বড়তাকিয়া উত্তর বাজারে হাতের বাঁয়ে খৈয়াছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে সহজেই চোখে পড়বে খৈয়াছড়া জলপ্রপাতের সাইনবোর্ড। সেখান থেকে সিএনজি অটোরিক্সাযোগে ২ কিলোমিটার পথ যাওয়ার পর একটি ঝিরিপথের দেখা মিলবে। এই ঝিরিপথ ধরে আরও প্রায় তিন কিলোমিটার হাঁটার পরেই পাওয়া যায় খৈয়াছড়ার প্রথম ধাপ। তবে স্থানীয় কোন গাইডের সহায়তা নিলে পথ কিছুটা সংক্ষিপ্ত হতে পারে। খৈয়াছড়ার প্রথম ধাপটি অসাধারণ। বেশ উঁচু থেকে পাহাড়ের নিরবতা ছাপিয়ে নিচে আছড়ে পড়ে সুশীতল পানি। এর পাশ দিয়েই খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে হবে বাকি নয়টি ধাপ। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠার পরে সামান্য নিচে নামার পর এর দ্বিতীয় ধাপ, যেটা প্রথম ধাপ থেকে একেবারেই আলাদা। সরু জায়গা থেকে প্রবাহিত ঝরনাধারা একটু নিচে এসেই প্রসারিত হয়ে গেছে এখানে। দ্বিতীয় ধাপ থেকে তৃতীয় ধাপটি আরো স্বতন্ত্র। এই জায়গা থেকে ভালোভাবে তিনটি ধাপের প্রবাহ দেখা যায়। এই ধাপটি গোসলের জন্যও বেশ জনপ্রিয়। এখানে অনেকটা বড়সড় পুকুরের মতো জলাধার আছে। এখান থেকে একেবারে ঝরনার পাশ থেকে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে হবে চতুর্থ ধাপে। তবে এ ধাপ থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ধাপের উচ্চতা তুলনামূলক কম। ওঠাও বেশ সহজ। খৈয়াছড়ার অষ্টম ধাপটি একটু উঁচুতে হলেও বেশ প্রসারিত। এখান থেকে কিছুটা খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে উঠলেই এর নবম ধাপ। এখানেও জলপ্রপাতটির ঠিক নিচে মাঝারি আকারের একটি গর্ত। এ জায়গাটিও গোসলের জন্য ভালো।

ডোমাখালী সমুদ্র সৈকত: বায়ান্ন বাঁকের বড় দারোগারহাট বেড়িবাঁধ সড়ক অতিক্রম করে দেখা মিলবে বিশাল সমুদ্র সৈকতের। শোনা যাবে অথৈই সাগরের গর্জন। দখিনা মিষ্টি হাওয়ায় শরীরটা শীতল হয়ে যাবে। উত্তরে দু'চোখ যত দূর যাবে, দেখা মিলবে সৈকতের, দক্ষিণে কেওড়া গাছের সবুজ বন। পশ্চিমে শুধু সাগর আর সাগর। চোখে পড়বে দুষ্ট ছেলের দল সাগরের পানিতে লাফালাফি করছে। ঘাটে বাঁধা সারি সারি নৌকা। জেলেরা কেউ মাছ ধরে সাগর থেকে ফিরছে, কেউ আবার সাগরে যাচ্ছে। এমন নৈসর্গিক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখার জন্য সেখানে প্রতিদিন ছুটে যাচ্ছেন ভ্রমণ পিপাসু নানা বয়সী বহু মানুষ। এশিয়ার বৃহত্তম শিল্পনগরী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের কাজ শুরু করার পর মেরিন ড্রাইভের বাঁধ নির্মাণের কারণে বিশাল এলাকাজুড়ে সমুদ্র সৈকত জেগে উঠেছে। মিরসরাই উপজেলার একেবারে দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত এই পর্যটনস্পটের নাম 'ডোমখালী সমুদ্র সৈকত'। শুধু দিনে নয়, রাতেও সাগরপাড়ে দেখা যায় বহু মোটর সাইকেল ও প্রাইভেট কার। রাতের বেলা সমুদ্রের গর্জন কান পেতে শুনতে সেখানে ছুটে যান তরুণেরা। পূর্ণিমা-রাতে সেখানে মানুষের ঢল নামে। এই সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ কিলোমিটার।

দেশের যেকোনো স্থান থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বড় দারোগারহাট নেমে সিএনজি অটোরিক্সা যোগে একেবারে সাগরপাড়ে যাওয়া যাবে। এ ছাড়া নিজামপুর

কলেজ সিএনজি অটোরিক্সা স্টেশনে নেমে সেখান থেকেও সিএনজি অটোরিক্সাযোগে যাওয়া যাবে।

রূপসী ঝরনা: মনটা যতই খারাপ থাকুক, রূপসী ঝরনায় পা ভেজালে আপনার মন ভালো হয়ে যাবে নিশ্চিত। রূপসী ঝরনার রূপের জাদু আপনাকে পাগল করবে। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের আরেক নাম বড় কমলদহ রূপসী ঝরনা। আঁকাবাঁকা গ্রামীণ সবুজ শ্যামল মেঠো পথ পার হয়ে পাহাড়ের পাদদেশে গেলেই শোনা যাবে ঝরনার পানি গড়িয়ে পড়ার অপরূপ ধ্বনি। দুই পাশে সুউচ্চ পাহাড়। সাঁ সাঁ শব্দে উঁচু পাহাড় থেকে অবিরাম শীতল পানি গড়িয়ে যাচ্ছে ছড়া দিয়ে। প্রথম দেখাতেই এই ঝর্ণার রূপে পাগল হবে যে কেউ। এর শীতল পরশ মুহূর্তে ক্লান্তি ভুলিয়ে দেবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পর্যটকেরা আবিষ্কার করবেন লাল আর নীল রঙের ফড়িংয়ের মিছিল! যতদূর পর্যন্ত ঝিরিপথ, ততদূর পর্যন্ত শোনা যাবে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। চলার পথে শোনা যাবে হরিণের ডাক। অচেনা পাখিদের ডাক। রূপসী এই ঝরনার পানিতে গোসল করার লোভ সামলানো যে কারো পক্ষে কঠিন হবে।

দেশের যেকোন স্থান থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বড় দারোগাহাট বাজারে নামবেন। এরপর প্রায় ১ কিলোমিটার সিএনজি অটোরিক্সাযোগে বাজারের উত্তর পাশের ব্রিক ফিল্ড সড়ক দিয়ে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত যাবে। এরপর পায়ে হেঁটে ঝরনায় যাওয়া যাবে।

বাওয়াছড়া লেক: রূপের পসরার অন্যতম এক অনুষঙ্গ হল বাওয়াছড়া লেক। ঝরনার পানি গড়িয়ে পড়ার কলকল ধ্বনি, পাহাড়িয়া সবুজ গাছের সমারোহে অতিথি পাখিদের কলতান। এমন পরিবেশে কার না মন জুড়াবে। যেকোন পর্যটক মুগ্ধ হবেন বাওয়াছড়া দেখে। এ যেন সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি, পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বারোমাসি ছড়ার নিকট অবস্থানের কারণে লেকটিকে বাওয়াছড়া লেক নামে ডাকা হয়। নীল আকাশের বিশালতার নিচে সবুজের সমারোহ। এখানে সকালের মিষ্টি রোদ আলো ছড়ায় আর অস্তগামী সূর্যের লালিমা মেখে দেয় দিগন্তজুড়ে। স্বর্ণালি স্বপ্নের মতোই তখন পুরো লেক সোনালী রূপ ধারণ করে। তাই পড়ন্ত বিকেলে এখানে এক মোহনীয় সময় পার করতে পারবেন। অবশ্য অনেকে রাতের বেলা চাঁদের আলোয় ঝরনার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে বাওয়াছড়া পাহাড়ের পাদদেশে ক্যাম্পিং করেন। জ্যোৎস্না রাতের রূপালী আভার সাথে ঝরনার নূপুর ধ্বনি এক অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করে এখানে।

দেশের যেকোন স্থান থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিরসরাই উপজেলার ছোট কমলদহ বাজারের দক্ষিণ পাশে নেমে মাত্র দেড় কিলোমিটার পূর্ব দিকে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত বাওয়াছড়া লেক যেতে পারবেন।

মুহুরী প্রকল্প: মুহুরী প্রকল্পে আছে আলো-আঁধারির খেলা। আছে জীবন-জীবিকার নানা চিত্র। মুহুরীর চর, যেন মিরসরাইয়ের ভেতর আরেক মিরসরাই। অন্তহীন চরে ছোট ছোট মৎস্য প্রকল্প। এপারে মিরসরাই আর ওপারে সোনাগাজী। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেচ প্রকল্পের ৪০ দরজার রেগুলেটরের শোঁ শোঁ আওয়াজ শোনা যায় দূর থেকে। পশ্চিমে মৎস্য আহরণের খেলা, আর পূর্বে মন কাড়া প্রকৃতি। নৌকায় করে কিছুদূর যেতেই দেখা যাবে সাদা বকের ঝাঁক। এখানে ভিড় করে সুদূরের বিদেশি পাখি, অতিথি পাখি বলেই অত্যধিক পরিচিত এরা। চিকচিকে বালিতে জল আর রোদের খেলা চলে সারাক্ষণ। সামনে পেছনে, ডানে-বায়ে সুন্দরের ছড়াছড়ি। মুহুরী প্রকল্প ঘেঁষে অবস্থান দেশের প্রথম বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পের।

ঢাকা-চট্টগ্রাম পুরাতন মহাসড়কের জোরারগঞ্জ বাজারে

দেখা মিলবে হরেক রকমের মোটরযানের। সড়ক পাড়ি দিতে হবে প্রায় আট কিলোমিটার। এরপর মুহুরী প্রকল্পের বাঁধ। যেতে যেতে দুই কিলোমিটার পরই দেখা মিলবে আসল সৌন্দর্য।

বোয়ালিয়া ঝরনা: বোয়ালিয়া অন্য ঝরনা থেকে অনেকটা ব্যতিক্রম। এখানে ছোট-বড় কমপক্ষে পাঁচটি ঝরনা এবং অনিন্দ্যসুন্দর একটি পাথুরে ঢাল আছে, যার নাম উঠান ঢাল। এ ট্রেইলের মূল ঝরনা হল বোয়ালিয়া। বোয়ালিয়া ঝরনার বিশেষত্ব হল, এই ঝরনার আকৃতি অদ্ভুত ধরনের, অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মতো এবং বোয়াল মাছের মাথার মতো বলে হয়তো নাম হয়েছে বোয়ালিয়া।

ভারী বর্ষায় মারাত্মক রূপ ধারণ করে এটি এবং এ সময়ে ঝর্ণাটি সবচেয়ে সুন্দর। মূল ঝর্ণার পানি যেখানটায় পড়ে, সেটা অনেকটা গুহা কিংবা গভীর খাদের মতো। ভরা বর্ষায় সাঁতরে এই ঝরনায় যেতে হয়। ঝরনার ওপরে আরো ছোট-ছোট ঝরনা আছে এবং ঝিরিপথ খুবই সুন্দর। তবে বোয়ালিয়ার ওপরে যাওয়াটা বিপজ্জনক এবং ভরা বর্ষায় প্রায় অসম্ভব। বোয়ালিয়া ট্রেইলের মূলত দুটি অংশ, উত্তর-পূর্ব আর দক্ষিণ-পূর্ব। দক্ষিণ-পূর্বে বোয়ালিয়া খুব দূরে নয়। তবে উত্তর-পূর্ব ট্রেইলে বিভিন্ন নামের আরো চার থেকে ছয়টি ছোট-বড় ঝর্ণা রয়েছে।

বেশিরভাগ ভ্রমণপিপাসু বোয়ালিয়া দেখে ফিরে আসেন, কিন্তু উত্তর দিকের ছড়া হয়ে উঠান ঢাল কিংবা নহাতিকুম ঝর্ণা পর্যন্ত যান না। অবশ্য উঠান ঢালে যেতে হলে দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়। পুরো পথটা যেতে হয় ছড়া দিয়ে হেঁটে হেঁটে। ঝিরিপথ হয়ে এক ঘণ্টা হাঁটার পর উঠান ঢালের দেখা মিলবে। পাহাড়ের বুকে পাথরের আস্তরণ আর পানি নিচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে কলকল করে, এমন সুন্দর দৃশ্য দেখলে যে কারোরই মন জুড়াবে।

উঠান ঢালের পরের পথটা ভয়ঙ্কর তবে অসম্ভব সুন্দর। বড়-বড় পাথর আর ছোট-ছোট কুমের সমাহার। পথটা খুবই পিচ্ছিল। প্রায় ১০ মিনিট কঠিন পথ পাড়ি দিলে নহাতিকুম ঝরনা পাওয়া যায়। এই ঝরনার উচ্চতা খুব বেশি নয় কিন্তু বেশ চওড়া। পুরো ঝরনা বেয়ে যখন পানি পড়ে তখন এর সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। অনেকের মতে নহাতিকুমের পরেও আরো ঝরনা আছে। না জানি এ পথে আরো কতটা রহস্য আর সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে।

Photo Credit: thefinancialexpress.com.bd

বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনা, সমস্যা ও সমাধানের উপায়

পদ্মা সেতু নির্মাণের ইতিহাস, বিশেষ করে দেশি-বিদেশি শক্তিশালী অনেক ব্যক্তি ও সংস্থার বিরোধিতা, সদ্য উন্নয়নশীল একটি দেশের নিজস্ব অর্থায়নে, বিশ্বের অন্যতম খরাস্রোতা ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত পদ্মা নদীতে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক পদ্মা সেতু নির্মাণ একটি অভাবনীয় ঘটনা।

মো. আব্দুল মালিক

শিক্ষক, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল, জালালাবাদ সেনানিবাস, সিলেট

আমি সাধুবাদ জানাই 'বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন'কে জাতির জনকের জন্ম শতবার্ষিকী, স্বাধীন বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের রেশ থাকাবস্থায় ২০২২ সাল জুড়ে সংস্থাটির পথ চলার গৌরবের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন এবং এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশেরও উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। এর ফলে আমাদের পর্যটনশিল্প অনেক দূর এগিয়ে যাবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বাংলাদেশে পর্যটনের সম্ভাবনা: নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, সবুজে শ্যামলে ছাওয়া দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ, হাওর-বাওর নদী, নালা, খাল, বিলবেষ্টিত জলাশয়, পাহাড় টিলাবেষ্টিত সবুজ বন, বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার, পৃথিবীর অন্যতম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ইউনেস্কো স্বীকৃত একাধিক স্থাপনা ও দর্শনীয় স্থান, মনকাড়া ঝর্ণাধারা, নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের আঁধার আমাদের এই বাংলাদেশ। এখানে রয়েছে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন, পুরাকীর্তি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থাপনা, রয়েছে

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিচিত্র জীবনধারাসহ দেশ বিদেশের পর্যটক আকর্ষণের নানা উপাদান। হালে যোগ হয়েছে পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতু নির্মাণের ইতিহাস, বিশেষ করে দেশি-বিদেশি শক্তিশালী অনেক ব্যক্তি ও সংস্থার বিরোধিতা, সদ্য উন্নয়নশীল একটি দেশের নিজস্ব অর্থায়নে, বিশ্বের অন্যতম খরাস্রোতা ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পদ্মা নদীতে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন একটি অভাবনীয় ঘটনা। তাই পদ্মা সেতু, পদ্মা নদী ও পদ্মার ইলিশকে বিদেশিদের কাছে আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করা হলে পর্যটনশিল্প আরো গতি পাবে নিঃসন্দেহে।

আমাদের এই দেশ শুধু বর্তমানে কেন, সুদূর অতীতেও বিশ্ববিখ্যাত পর্যটকদের আকর্ষণ করেছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বাংলা ভ্রমণে এসেছিলেন রোমান পর্যটক 'গ্রিনি'। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে এসেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার 'টলেমি', পঞ্চম শতকে আসেন চৈনিক তীর্থযাত্রী ফা-হিয়েন, সপ্তম শতকে আসেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ, বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক, মরক্কোর অধিবাসী ইবনে বতুতা ১৩৪৫/৪৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভ্রমণে এসেছিলেন। ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে আসেন চৈনিক পরিব্রাজক 'মা-হুয়াং'। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ বণিক পরিব্রাজক 'সেবাতিন মানরিক' ঢাকায় আসেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ, ফরাসি ও ইতালিয়ানসহ বিশ্বের বহু দেশের বহু বিখ্যাত পর্যটক এ দেশ ভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁদের অনেকের লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত এদেশের অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। অতীতের মতো বর্তমানেও বাংলাদেশে পর্যটনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি পর্যটন খাত। আমাদের জিডিপির মাত্র ৪ শতাংশ আসে পর্যটন থেকে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে স্বল্প আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। মানুষের আর্থিক সক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ এখন ভ্রমণপিয়াসী। তাই আমাদের দেশে পর্যটন খাতের অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জাতীয় স্বার্থে পর্যটন খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া এখন সময়ের দাবি।

কারণ স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ায় পূর্বে প্রাপ্ত অনেক আর্থিক সুবিধা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হবে। তাছাড়া করোনা পরবর্তী বিশ্বমন্দা ও ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাবে তৈরিপোশাক খাত, প্রবাসী আয় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যে টান পড়বে তা থেকে উত্তরণের জন্য পর্যটনখাতকে গুরুত্ব দিতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তথাপিও এক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এসব সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে নিচে কিছুটা আলোকপাত করা হলো।

পর্যটনের সমস্যা:

১। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা;
২। অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর (বিশেষ করে নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে) পরিবেশ;
৩। শৌচাগারের অভাব;
৪। পানীয় জল ও থাকা-খাওয়ার মানসম্মত সুলভ ব্যবস্থা না থাকা;
৫। দক্ষ গাইডের অভাব;
৬। যথাযথ প্রচারের অভাব।

পর্যটন সমস্যা সমাধানের উপায়:

১। পর্যটন খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। যেভাবে দেওয়া হয়েছে পদ্মা সেতু নির্মাণে, বিদ্যুৎ উন্নয়নে, ঢাকার যানজট নিরসনে, রেলের উন্নয়নে। ঠিক সেভাবে পর্যটন খাতকে গুরুত্ব দিতে হবে।

২। পর্যটন আইন সংশোধন করে যুগোপযোগী করতে হবে।

৩। পর্যটন এলাকায় যাওয়া-আসার জন্য আকাশপথ, রেলপথ, সড়কপথ, জলপথ যেখানে যা প্রয়োজন সেসব ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।

৪। পর্যটকদের পর্যটন এলাকায় যাওয়া-আসা ও সেখানে অবস্থানকালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। পর্যটন এলাকায় পর্যটকদের নিরাপদ ও নির্ভয়ে যাওয়া-আসার জন্য পর্যটনের নিজস্ব পরিবহনব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় পর্যটনের নিজস্ব পরিবহনের ব্যবস্থা করা না গেলে বিআরটিসি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন ধরনের পরিবহন মালিক ও ড্রাইভারদের সাথে চুক্তি করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভাড়া সুনির্দিষ্ট থাকবে। যেমন: ঢাকা থেকে একদল পর্যটক পদ্মা সেতু হয়ে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে যেতে চায়, তাঁদের সংখ্যা অনুযায়ী বাস বা মাইক্রোবাস, কার বা জিপ গাড়ির প্রয়োজন। তারা ফোনে, ম্যাসেঞ্জারে, হোয়াটস অ্যাপ বা ইমেইলে পর্যটন অফিসের সাথে যোগাযোগ করে যেন প্রয়োজনীয় যানবাহন বুকিং দিতে পারে সে রকম ব্যবস্থা করা হলে পর্যটকরা সহজে, নির্ভয়ে ও সুনির্দিষ্ট ভাড়ায় পছন্দের পর্যটনকেন্দ্রে যেতে পারবে। তখন পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যেসব গাড়ির মালিক, ড্রাইভারদের সাথে পর্যটন করপোরেশন চুক্তিবদ্ধ হবে তাদের ও স্টাফদের ডাটাবেজ সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এভাবে ঢাকা থেকে সারাদেশে যানবাহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুরূপভাবে প্রতিটি বিভাগ ও জেলায় পরিবহনব্যবস্থা গড়া হলে পর্যটকের সংখ্যা দিন দিন বাড়বে।

৬। অনেক স্থানে পর্যটন এলাকার মূল স্পটে ছোট, বড় কোন যানবাহনই যায় না। সেখানে স্থানীয় যানবাহন যেমন নৌকা, স্পিডবোট, রিক্সা, সিএনজি, টমটম ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে হয় সেখানে পর্যটনের পর্যাপ্ত যানবাহন রাখতে হবে, নতুবা স্থানীয় যানমালিক ও ড্রাইভারদের সাথে যথাযথ চুক্তি সম্পাদন করে ডাটাবেজ সংরক্ষণ করে সেখানে কাজ করার অনুমতি দিতে হবে। ফলে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবেন না বা তাদের অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হবে না। পর্যটকরা যখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে না, তখন পর্যটক সমাগম বৃদ্ধি পাবে।

৭। পর্যটন এলাকায় পর্যটনের প্রশিক্ষিত পর্যাপ্ত সংখ্যক গাইড রাখতে হবে। তারা পর্যটকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন এবং পর্যটন এলাকার বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি পর্যটকদের সামনে তুলে ধরবে। ফলে পর্যটকেরা সে স্থান সম্পর্কে জানতে পারবে। আরো জানা বা গবেষণার আগ্রহ সৃষ্টি হলে বার বার সেখানে যাবে। ফলে পর্যটন খাত লাভবান হবে।

৮। পর্যটন এলাকায় ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি হচ্ছে কি না সেটা নজরদারি ও তদারকি করতে হবে। এমনকি পর্যটনে যথাযথ তালিকাভূক্তি ছাড়া কোন হকার বা দোকানদার সেখানে যাতে থাকতে না পারে সে ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে।

৯। প্রতিটি পর্যটন এলাকা বা স্থাপনা পাকা দেয়াল দিয়ে বা অন্যভাবে আলাদা করে সংরক্ষণ করতে হবে। ফলে এর প্রতি আকর্ষণ বাড়বে, এই সংরক্ষিত এলাকায় অবাঞ্চিত অথবা অননুমোদিত লোক যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। পর্যটন এলাকায় নারী পুরুষদের জন্য আলাদা প্রয়োজনীয় সংখ্যক শৌচাগার, পানীয়-জলের ব্যবস্থা, রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা ও বিশ্রামের জন্য ছাউনি, প্রার্থনার স্থান রাখতে হবে।

১১। যেসব পর্যটন এলাকায় লোকসমাগম বেশি হয় এবং যেগুলোর অবস্থান শহর থেকে অনেক দূরে, সেখানে ন্যায্যমূল্যে থাকা-খাওয়ার জন্য পর্যটনের হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১২। পর্যটন এলাকার পরিবেশ দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর রাখতে পর্যটকরা যেখানে সেখানে যাতে মলমুত্র ত্যাগ না করেন, উচ্ছিষ্ট খাবার বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য দ্রব্যাদি যেখানে-সেখানে না ফেলেন, সে জন্য মাইকে সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা থাকবে। যেসব পর্যটক উচ্ছিষ্ট ফেলে দেবেন তা তাৎক্ষণিক অপসারণের জন্য পর্যটনের পরিচ্ছন্নতাকর্মী সেখানে নিয়োগ দিতে হবে।

১৩। যেসব পর্যটন এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক ভালো নয়, সেখানকার নেটওয়ার্ক উন্নত করতে হবে এবং ওয়াইফাই সংযোগ দিতে হবে।

১৪। বিপদজ্জনক পর্যটন এলাকায় সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড রাখতে হবে। তদুপরি পর্যটনের পুলিশ ও কর্মীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে ও সতর্ক অবস্থানে রাখতে হবে।

১৫। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে ৬৫ হাজার যুবশক্তিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করে প্রশিক্ষিত যুবাদের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। এসব প্রশিক্ষিতদের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে।

১৬। নতুন নতুন পর্যটনস্পট আবিষ্কার করতে হবে। সেখানে যাওয়ার জন্য রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

১৭। বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোকে সক্রিয় করতে হবে।

১৮। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত প্রবাসীরা প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণে যান। কিন্তু বাংলাদেশে আসেন না। কারণ বাংলাদেশ বিমান, এয়ারপোর্ট থেকে প্রতিটি স্থানে তারা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের আকর্ষণ করতে দূতাবাস ও পর্যটন করপোরেশনকে আরো উদ্যোগী হতে হবে। প্রবাসী নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন সংগঠনকে শুভেচ্ছাদূত নিয়োগ করা যেতে পারে।

১৯। বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি মিশনপ্রধানদের নিয়ে বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় শুভেচ্ছা ভ্রমণের ব্যবস্থা করা এবং তাদের অনুভূতি অভিব্যক্তি সংগ্রহ করে সেসব দেশে ব্যাপক প্রচার করা যেতে পারে।

২০। স্বল্প খরচে পর্যটন মেলার আয়োজন করা।

২১। প্রতিটি জেলা থেকে চাহিদামাফিক দেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনস্পটে সপ্তাহ/পাক্ষিক/মাসিক বা মৌসুমভিত্তিতে প্যাকেজ ট্যুর চালু করা হলে একক ব্যক্তি বা ছোট পরিবার বা স্বল্প আয়ের মানুষ সেই সুযোগ গ্রহণ করবে।

২২। পর্যটনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পর্যটনে উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২৩। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে যাত্রীবান্ধব করা

এবং বিমানযাত্রীদের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত বাংলাদেশের পর্যটন সংক্রান্ত ম্যাগাজিন, বুকলেট, বই ইত্যাদি প্রদান করা।

২৪। পর্যটনের পুরো এলাকা, প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পথে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে এসব ক্যামেরা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়ভাবে মনিটর করতে হবে। ফলে সেবাদাতা ও গ্রহীতারা সতর্ক থাকবেন এবং কোন সমস্যা হলে সহজেই প্রকৃত ঘটনা নির্ণয় করা যাবে।

২৫। হযরত শাহজালাল, হযরত শাহপরান (রহঃ) ও ৩৬০ আউলিয়ার পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত, শ্রী চৈতন্যের পিতৃভূমি, দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ, জাফলং, মাধবকুণ্ড, সাদাপাথর, বিছানাকান্দি, রাতারগুল, লালাখাল, টাঙ্গুয়ার হাওরসহ অন্যান্য পিকনিকস্পটে প্রতিদিন, বিশেষ করে শুক্র ও শনিবার, প্রচুর পর্যটক আসেন আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেটে। এসব পর্যটকদের জন্য শহর বা শহরতলীতে পর্যটনের হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ এবং যানবাহন খুবই লাভজনক হবে। এভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহীসহ অন্যান্য পর্যটনবান্ধব জেলা শহরে উন্নত ও মধ্যমমানের হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ ও যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা হলে পর্যটন খাত লাভজনক হবে।

২৬। পর্যটন স্পট ইজারা প্রদানের পরিবর্তে পর্যটন করপোরেশনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হলে আরও বেশি সুফল পাওয়া যাবে। কারণ ইজারাদারদের বাড়তি লাভ ও অজ্ঞতার জন্য পর্যটকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া ইজারাদাররা শিক্ষার্থীদের আর্থিক ক্ষেত্রে ছাড় না দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যা কাম্য নয়।

২৭। স্থানীয় প্রশাসনকে পর্যটনবান্ধব প্রশাসনে পরিণত করতে হবে।

২৮। পর্যটন এলাকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি সমৃদ্ধ একাধিক সাইনবোর্ড রাখতে হবে। কোন পর্যটক কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে যেন তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন সেজন্য মোবাইল নম্বরও দেওয়া থাকবে।

২৯। পিকনিক স্পটে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, অভিযোগ ও পরামর্শ কেন্দ্র চালু করা বা বক্স রাখা যেতে পারে।

উপরোক্ত বিষয় এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হলে বাংলাদেশে পর্যটন খাতের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এবং সরকার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন জাতি এই প্রত্যাশাই করে।

Photo Credit: Encyclopedia Britannica

যেতে যেতে পথে...

বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা পরিভ্রমণের এই স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে আমি বাংলার রূপ, রস ও ঘ্রাণ উদ্‌যাপনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই আনন্দযজ্ঞ পরিদর্শনে আপনি শুধু মুগ্ধই হবেন না, ইচ্ছে করবে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে।

মোঃ আল-আমিন

প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনকে উদ্‌যাপন করার বিচিত্র যত আয়োজন রয়েছে, তার মধ্যে ভ্রমণ আমার কাছে মহোত্তম। নিজেকে ও অন্যকে জানা-বোঝার জন্য ভ্রমণ হচ্ছে কার্যকরী মাধ্যম। বস্তুত মানুষ যখন থেকে হাঁটতে শেখে তখন থেকেই তার ভ্রমণ শুরু। মৃত্যু অবধি এই ভ্রমণ চলতে থাকে। একজন মানুষের পরিভ্রমণ পথকে কোনো জেলা, দেশ ও মহাদেশের সীমানার মাধ্যমে বর্ণনা করতে চাই না। পৃথিবীর ভূমিপুত্র হিসেবে পুরো পৃথিবীই মানুষের। এই উর্বর ভূমিতে নিজের এই বিচরণ বিশ্ব পর্যটক হওয়ার সূচনা মাত্র। বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা পরিভ্রমণের এই স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে আমি বাংলার রূপ, রস ও ঘ্রাণ উদ্‌যাপনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই আনন্দযজ্ঞ পরিদর্শনে আপনি শুধু মুগ্ধই হবেন না, ইচ্ছে করবে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে। আর খুঁজে পাবেন জীবনের আসল স্বাদ।

প্রথম ঢাকায়

নিজ জেলা কুমিল্লার বাইরে প্রথম যাত্রা ঢাকায়। উদ্দেশ্য অসুস্থ বাবাকে দেখা। সময়টা ছিল ২০০০ সাল। দ্বিতল বাসে চড়ে যখন ঢাকা দেখলাম, তখন অন্য রকম রোমাঞ্চ কাজ করছিল। নাগরিক সংস্কৃতির নানা উপকরণের এই চাক্ষুষ দর্শন আমাকে আনন্দে উদ্বেলিত করেছে। স্বল্পসময়ের এই অবস্থানের মধ্য দিয়ে জানতে পারলাম জীবন অনেক বড়। এরপর আবার ঢাকায় আসার উদ্দেশ্য ছিল বৈষয়িক। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য এই অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে আট বছর। পুরান ঢাকার ঐশ্বর্য্য ও নতুন ঢাকার নান্দনিক সব স্থাপত্য মুগ্ধ নয়নে দেখেছি। আপনিও দেখতে পারেন ঢাকেশ্বরী মন্দির, কার্জন হল, লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, জাতীয় সংসদ ভবন, জাতীয়

স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার, বিউটি বোর্ডিং, ফরাশগঞ্জ লালকুঠি, চন্দ্রিমা উদ্যান, রমনা পার্ক, শাঁখারী বাজার, বলধা গার্ডেন, রোজ গার্ডেন, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি। গভীর রাতে ঢাকার নির্জন রাস্তায় রিক্সা নিয়ে ঘুরে বেড়ালে কেমন লাগে তা আপনি দেখতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়াকালীন ট্যুরিস্ট সোসাইটিসহ নানাবিধ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছে দেশের অনেকগুলো জায়গা। বন্ধু, সহপাঠী ও সহকর্মীদের সাথে এই ভ্রমণ জীবনকে নতুনভাবে জানতে সহায়ক হয়েছে।

যাদুকাটা, করতোয়া ও সোমেশ্বরীর জল

নদী আমার বিশেষ আকর্ষণের জায়গা। তাই বারবার ছুটে যাই নদীর কাছে। শত নদীর ভিড়ে আমার মনে পড়ে সুনামগঞ্জের যাদুকাটা, পঞ্চগড়ের করতোয়া ও নেত্রকোণার সোমেশ্বরীর জলের স্পর্শ। এই স্পর্শ আমাকে শুধু পুলকিতই করেনি, মনে হয়েছে, মাটির মানুষ হিসেবে মাটি ও জলের কাছ থেকে জীবনের রশদ নিতে হবে। পানিতে ভেসে ভেসে মনে হয়েছে সমস্ত দুঃখ, কষ্ট ও হতাশা ভাসিয়ে দিয়ে যদি সুখের সাগরে ভেসে থাকা যেত তাহলে কতই না ভালো হতো। শান্ত নদীর শীতল বাতাস যখন আপনার গায়ে লাগবে, তখন মনে হবে সারা জীবন এই নদীতীরেই কাটিয়ে দেয়া যায়।

'আকাশে উড়িলাম, জলেতে ভাসিলাম'

ছোটবেলায় যখন আকাশযান দেখতাম, তখন ভাবতাম আমিও যদি আকাশে উড়তে পারতাম। স্বপ্নপূরণের এই সময় আসে ২০২১-এর ডিসেম্বর মাসে। ঢাকা থেকে কাঠমান্ডু যাত্রা ছিল সারাজীবন মনে রাখার মতো। বিমান থেকে হিমালয় পর্বতমালার নৈসর্গিক দৃশ্য দেখার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার নয়। বিমান থেকে যখন পাহাড়, নদী, লোকালয় ও বৃহৎ স্থাপনাগুলোর অনুকৃতি দেখছিলাম এবং দেখলাম ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক দূরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছি, তখন চোখ বন্ধ করে কল্পনা করলাম, আমি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, কোথাও কেউ নেই শুধু আমার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া।

নিজেকে গভীরভাবে অনুভব করে নিজের স্মৃতিময় অতীতের পাপ-পূণ্যের কথা মনে করে স্ব-মূল্যায়নের এক নতুন ধারা আবিষ্কার করলাম। ভাবলাম, পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করতে হবে। বিমানের চাকা যখন ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে স্পর্শ করলো তখন নিজের অস্তিত্বকে ভিন্নভাবে অনুভব করলাম। আমার জলেতে ভাসার ইতিহাস অনেক পুরোনো। গ্রামের ছেলে হিসেবে জলের সাথে সখ্যতা অনেক আগেই গড়ে উঠেছে। তবে বৃহৎ জলযানে প্রথম চড়া ২০১৬ সালে। তখন খুলনা থেকে এমভি ওয়াটার কিং ৮-এ করে সুন্দরবন গমনের সময় শুশুকের ডিগবাজি ছিল দেখার মতো। লোকালয় ছেড়ে আমরা যতই গভীর বনের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিলাম, ততই গাঢ় সবুজের স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হচ্ছিলাম। লঞ্চ থেকে দেখলাম – হরিণের পাল বনে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, দেখা হল মৌয়াল, বাওয়ালি, জেলেদের। কিন্তু বাঘ মামার দেখা পেলাম না।

পূর্ণিমার আলোয়

পূর্ণিমা উদ্‌যাপনের সাড়ম্বর আয়োজনে যুক্ত হওয়া আমার জীবনের বিশেষ ঘটনা। পূর্ণিমা মানেই অন্যরকম আবহ। চাঁদের ধবধবে সাদা আলোয় খোলা প্রাঙ্গণে বসে স্মৃতি রোমন্থন করি প্রিয় মানুষের সাথে। মনে পড়ে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ি জমিদার বাড়িতে পূর্ণিমার আলোয় বার বি কিউ পার্টির কথা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ছাদে আয়োজিত পূর্ণিমা উৎসবে নিয়মিত যোগ দিয়েছি। পূর্ণিমাকে ভালোবেসে যুক্ত হয়েছি জোছনাতরী (ভ্রমণ সংঘ)-এর বিভিন্ন আয়োজনে। টাঙ্গুয়ার হাওর ও কুয়াকাটায় পূর্ণিমা উদ্‌যাপন করে নিজেকে নতুনভাবে খুঁজে পেয়েছি।

নিঝুম দ্বীপে নির্ঘুম এক রাত

নিঝুম দ্বীপ – যেন আনন্দভুবন। বিচ্ছিন্নতা, নিঃস্তব্ধতা এবং স্বর্গীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন অনন্য করে তুলেছে নিঝুম দ্বীপকে। ২০১৮ সালে এই জনপদে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। নিঝুম দ্বীপে আমরা যখন রাত্রিযাপন করি, সে রাতে ছিল পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় বিস্তৃর্ণ সৈকতে হেঁটে বেড়ানোর স্মৃতি কখনো হারিয়ে যাবে না।

পূর্ণিমার আলোয় গল্প-আড্ডা ও গানে রাত কাটিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে অনুভূতি টের পেয়েছি তা আর পাব কি না সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। ভোরের সূর্যের রক্তিম আভা ও আলো যখন দ্বীপজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তখন অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। হরিণের খোঁজে শ্বাসমূল ডিঙিয়ে গভীর বনে দলবেঁধে ঢুকে হরিণ দেখতে পেয়ে চোখ জুড়ে নেমে এসেছিল প্রশান্তি।

আঁধার থেকে আলোয়

অন্ধকারকে সবাই ভয় পায়। আমিও ব্যতিক্রম নই। খাগড়াছড়ির আলুটিলা গুহায় যখন প্রথম পা ফেললাম, তখনো ভাবিনি আমাদের সামনে কী অপেক্ষা করছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে পাথুরে পথে নিভু নিভু মশাল নিয়ে যখন ভীতসন্ত্রস্ত এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আলোর সান্নিধ্য পাওয়ার আকুতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। দমবন্ধ এই পরিবেশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকারান্তরে জীবনের সৌন্দর্যকে আরো বেশি উপভোগ করার ইচ্ছা তীব্র হচ্ছিল।

মনে হচ্ছিল – আলোই সব। আলোয় ভরা ভুবনে জীবনকে আলোকময় করার সংকল্প করলাম। দারুণ রোমাঞ্চকর এই পথ পাড়ি দিয়ে একসময় আলোর দেখা পেলাম।

বগা লেকে স্নান

সময়টা ছিল ২০১৫। বান্দরবানের রুমা থেকে কেওক্রাডং-এর উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আমরা যখন বগা লেক পাড়ায় পৌঁছাই তখন শরীরে ভর করে রাজ্যের ক্লান্তি। ততক্ষণে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। কোন কিছু না ভেবে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম বগা লেকে। লেকের শীতল জলে স্বর্গীয় অনুভূতি পেলাম।

ডাকছে বনের সবুজ ঘাস

ভাওয়াল, আলতাদীঘি, কাদিগড়, কাপ্তাই, কুয়াকাটা, নিঝুম দ্বীপ, বীরগঞ্জ, মধুপুর, রামসাগর, লাউয়াছড়া, সাতছড়ি, সিংড়া ও জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান এবং রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে গিয়েছি। বনের সবুজের স্নিগ্ধতা, পাখি, ফুল-ফলে মুগ্ধ হয়েছি। সবুজের এই বিস্তৃত প্রাঙ্গণের নামই বাংলাদেশ। বাববার ফিরে যেতে চাই গভীর বনে। আপনিও বাংলাদেশের জাতীয় উদ্যান ও সাফারি পার্কগুলোতে ঘুরে আসতে পারেন। ঘুরে দেখতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, খুলনা, কুমিল্লা, বাংলাদেশ কৃষি ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। দেখতে পারেন লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, জাতীয় জাদুঘর, জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর, পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন জাদুঘর, নৌকা জাদুঘর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, নভোথিয়েটার।

'একলা চলো রে'

অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান বাড়াতে নতুন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আছে নতুন মানুষের। একাকী ভ্রমণ তাই আমার কাছে মেডিটেশনের মতো। একাকী যাত্রায় গাড়ির চালকই অনেক সময় হয়েছে পথপ্রর্দশক। সাথে গুগল ম্যাপতো ছিলই। গরুর গাড়ি থেকে ঘোড়ার গাড়ি – কোন যানবাহনে চড়া বাদ রাখিনি। গাড়োয়ানদের জীবনের গান ও গল্প কান পেতে শুনেছি। বুঝতে পেরেছি – জীবন পুষ্পশয্যা নয়।

বাংলার স্বাদ ও ঘ্রাণ

খাবারের স্বাদ অন্বেষণে যে কত শত খাবার খেয়েছি তা গুণে শেষ করা যাবে না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খাবারের স্বাদ, পরিবেশনের ধরণ, উপকরণের বৈচিত্র্য খাদ্যপ্রেমী হিসেবে আমাকে মুগ্ধ করেছে। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি – সারা পৃথিবী ঘুরে এসেও বাংলার নানা প্রকার খাবারের স্বাদ ভুলব না। চমচম, মন্ডা, বাকরখানি, ছানার পোলাও, পায়েস, আখের রস, বাদাম, চা, পান, তিলের খাজা, খই, নাড়ু, জিলাপি, সামুদ্রিক মাছ, পুরি, চটপটি, ফুচকা, সিংগারা, সমুচা, খেজুরের গুড়, রসমালাই, সন্দেশ, কালাই রুটি, ঘি, হালিম, ঝালমুড়ি, কাচ্চি বিরিয়ানি, মেজবানের মাংস, রসগোল্লা, দই, নানান রকম পিঠা-পুলি, পান্তা-ইলিশ, নানান রকম ভর্তার স্বাদ পেয়ে মনে হবে খাওয়ার জন্য হলেও এই বাংলায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে হবে। বর্ষার কদম, গন্ধরাজ, গাদা, গোলাপ ও বনফুলের সুবাস সুবাসিত করবে আপনার অন্তর।

উৎসবে আনন্দে মানুষের মুখ

রাখের উপবাস, নবান্ন, সাকরাইন, বৈসাবি, রাশ মেলা, বাণিজ্য মেলা, ঘুড়ি উৎসব, মধু মেলা, শরৎ উৎসব, ভালোবাসা দিবস, চৈত্র সংক্রান্তি, আশুরা, ওয়ানগালা, ফানুস উড্ডয়ন, মঙ্গল শোভাযাত্রা, বিজয় উৎসব, ভাষা দিবস, নৌকা বাইচ, হোলি উৎসব, পূজা, ঈদ, বুদ্ধ পূর্ণিমা, বড়দিন, জন্মাষ্টমী, বসন্ত উৎসব, রথযাত্রা, দোলযাত্রায় দেখবেন বাংলার মানুষ কতটা হাসতে, নাচতে ও গাইতে জানে। উৎসবের আলোয় উদ্ভাসিত মানুষের মুখ আপনার মনকে উৎসুক করবে তাদের জীবনজয়ের গল্প জানতে।

গলা ছেড়ে গাই গান

গম্ভীরা, লালন, পঞ্চকবি, পালা, বাউল, জারি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া শুনতে পারেন। রমনার সবুজ চত্বরে ছায়ানটের সাথে গলা মিলিয়ে গাইতে পারেন বর্ষবরণের গান – 'এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো'। এখানকার মঞ্চনাটক, পথনাটক, চলচ্চিত্র, ধ্রুপদী নৃত্য, পুতুলনাচ, যাত্রাপালা প্রাণভরে উপভোগ করতে পারেন। দেখবেন অবসরে লোকজন ক্যারাম-লুডু নিয়ে বসে গেছে। আপনিও তাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন।

'ফিরে চল্ মাটির টানে'

নগরসংস্কৃতির নানা অভিঘাতে আমরা যখন ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ি তখন যাবতীয় অপ্রাপ্তি, দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য গ্রামে ভ্রমণ মহৌষধী হিসেবে কাজ করে। একই বাংলায় জীবনের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য আমাদের বুঝিয়ে দেয় বাংলাদেশের মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের কথা। গ্রাম হলো বাংলাদেশের প্রাণ। গ্রামীণ জীবনের নানা অনুষঙ্গ দর্শন করে আপনি তৃপ্ত হবেন। গ্রামের ফলের বাগান, পিঠা-পুলি, মিঠাপানির মাছ, গরুর গাড়ি, মাঠ থেকে ফসল সংগ্রহ, ছোট্ট শিশুদের অবাধ সাঁতার, হাট-বাজার, রাখালের বাঁশি, গ্রাম্য মেলা, বিয়ে উৎসব আপনাকে মুগ্ধ করবে। পথে দেখবেন ছেলেপুলেরা হাডুডু, ক্রিকেট ও ফুটবল নিয়ে মেতে উঠেছে। শর্ষের মাঠে শিশুদের হাসি, গ্রাম্য শিশুর শাপলা হাতে বাড়ি ফেরা, নদী থেকে পানি সংগ্রহ আপনার চোখ জুড়িয়ে দেবে।

কী নেই এখানে? এই আনন্দস্থলে ক্লান্ত হয়ে গেলে জিরিয়ে নেবেন বটের ছায়ায়। শুনবেন রাখালের বাঁশি। গ্রাম পর্যটনকে এগিয়ে নিতে পারলে পৃথিবীর কাছে আমরা এ দেশকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারব। সময় করে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন প্রণালীও দেখতে পারেন।

রাজ্যটাই শুধু আছে

পুরোনো বাড়ি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর স্থাপনাগুলো দেখে পৃথিবী ও সময়ের কাছে আমরা যে কতটা ক্ষুদ্র তা অনুভব করি। প্রত্নতত্ত্বের খোঁজে গিয়েছি – উত্তরা গণভবন, মহেরা জমিদার বাড়ি, তাজহাট জমিদার বাড়ি, পুটিয়া জমিদার বাড়ি, বালিয়াটি জমিদার বাড়ি, শশীলজ, হরিপুর জমিদার বাড়ি, মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ি, দালাল বাজার জমিদার বাড়ি, পানাম নগর, তাজহাট জমিদার বাড়ি, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, ষাট গম্বুজ মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, শালবন বিহার, নবরত্ন মন্দির, সোনাকান্দা ও হাজীগঞ্জ দূর্গে। হেঁটে বেরিয়েছি প্রাচীন পুন্ড্রনগরীতে। পুরোনো এসব স্থাপনা দেখে থমকে দাঁড়াই। ভাবি, আমরাও একদিন ইতিহাস হয়ে যাব।

'পথ চলতে, পথ চলতে'

চোখে অ্যাডভেঞ্চারের চশমা লাগিয়ে ঘুরেছি কত শত জায়গা। চলতে চলতে দেখেছি – রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, স্বর্ণমন্দির, কান্তজিউ মন্দির, নীলসাগর, বাঘা মসজিদ, ভাসমান পেয়ারা হাট, তাঁতপল্লী, ঝুলন্ত সেতু, দুবলার চর, মনসা বাড়ি, এশিয়ার বৃহত্তম বটবৃক্ষ, মধুপল্লী, আমঝুপি নীলকুঠি, তাল সড়ক, মুহুরী সেচ প্রকল্প, তিস্তা বাঁধ, আকাশনীলা ইকো ট্যুরিজম সেন্টার, সুলতান কমপ্লেক্স, মনপুরা, ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার, গান্ধী আশ্রম। গিয়েছি ঐতিহ্যের কাছাকাছি। সাগর তীর থেকে মিষ্টি হাওয়া নিতে গিয়েছি নারিকেল জিঞ্জিরা, পতেঙ্গা, কক্সবাজার ও সুন্দরবনের সমুদ্র সৈকতে। চলন বিল, রাইসার বিল, নিকলি-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম হাওর, কাপ্তাই লেক, নিলাদ্রী লেক, শকুনী লেক, দূর্গাসাগর, মাধবপুর লেক ও টাঙ্গুয়ার হাওরে গিয়েছি হাওয়া খেতে। প্রকৃতির সান্নিধ্য পেতে গিয়েছি – বিছানাকান্দি, নুহাশ পল্লী, শ্রীমঙ্গলের চা বাগান, লালাখাল, শুভলং ঝরনা, রিছাং ঝরনা, হামহাম ঝরনা, হিমছড়ি ঝরনা ও চিনামাটির পাহাড়ে। ইলিশ খেতে গিয়েছি মাওয়া ঘাট ও চাঁদপুরে। মেঘের ভেলায় ভাসবো বলে গিয়েছি নীলাচল, নীলগিরি, চিম্বুক, তাজিংডং ও কেওক্রাডংয়ের চূড়ায়। বাংলার পথে হেঁটে বেড়ানোর এই স্মৃতিগুলো নিয়ে বাঁচতে চাই।

এই যাত্রার শেষ নেই

দেশের চৌষট্টি জেলার বেশিরভাগ জায়গায় গেলেও আরও অনেক জায়গায় ঘুরতে যেতে চাই। যে স্থানের সৌন্দর্য শীতকালে দেখেছি, বসন্তে আবার দেখতে চাই। হয়তো এক জেলার কয়েকটি খাবার খেয়েছি, বাকিগুলোরও স্বাদ নিতে চাই। জীবনের মহোৎসব পরিদর্শন করতে চাই। হেঁটে বেড়াতে চাই পৃথিবীর 'পরে।

নিমন্ত্রণ

নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের মানুষগুলো ভালোবাসতে জানে। জানে নিজের দাওয়ায় শীতলপাটি বিছিয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে। এই উর্বর স্বর্গভূমি আপনার ভ্রমণের নেশাকে পূর্ণ করবে। তাই এখনই রোদচশমা, কম্পাস, মানচিত্র, দূরবীন, বই, ডায়েরি, স্মার্টফোন, হ্যামক ও তাঁবু নিয়ে বেড়িয়ে পড়ুন আধুনিক পর্যটক হিসেবে নতুন অভিযানে। 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'।

Photo Credit: Ajker Patrika

পর্যটন নগরী কক্সবাজারের ইতিহাস

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সি-অ্যাকুরিয়াম, ক্যাবল কার এবং ডিজনি ল্যান্ড। এ ছাড়া সমুদ্রের তীর ঘেষে টেকনাফ উপজেলার দিকে চলে গেছে মেরিন ড্রাইভ রোড। যেখান থেকে সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগে অনেক সুবিধা হয়েছে।

বিভীষণ মিত্র, কক্সবাজার

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত বাংলাদেশের তথা বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন নগরী। নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৬১৬ সালে মুঘল অধিগ্রহণের আগে কক্সবাজারসহ চট্টগ্রামের একটি বড় অংশ আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুঘল সম্রাট শাহ সুজা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে আরাকান যাওয়ার পথে কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন এবং এখানেই ক্যাম্প স্থাপনের আদেশ দেন। তার যাত্রাবহরের প্রায় ১ হাজার পালঙ্কী কক্সবাজারের চকরিয়ার ডুলাহাজারা নামক স্থানে অবস্থান নেয়। ডুলাহাজারা অর্থ হল হাজার পালঙ্কী। মুঘলদের পরে ত্রিপুরা ও আরাকান, তারপর পর্তুগিজ ও ব্রিটিশরা এই এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেয়। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি হিসেবে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীরা চকরিয়ায় ১৩ জন লোককে হত্যা করে এবং বিভিন্ন স্থানে বাড়িঘর ও দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়। এ সময় পাকবাহিনী টেকনাফ ডাকবাংলোতে ক্যাম্প স্থাপন করে এবং রামু, উখিয়া ও টেকনাফ থেকে প্রায় ২৫০ জন নিরীহ লোককে ক্যাম্পে নিয়ে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এখানে রয়েছে তিনটি স্মৃতিস্তম্ভ এবং একটি বধ্যভূমি।

কক্সবাজার নামটি এসেছে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স নামে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক অফিসারের নাম থেকে। কক্সবাজারের আগের নাম ছিল পালঙ্কী। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধ্যাদেশ ১৭৭৩ জারি হওয়ার পর ওয়ারেন্ট হোস্টিং বাংলার গভর্নর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তখন হিরাম কক্স পালঙ্কীর মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। ক্যাপ্টেন কক্স আরাকান শরণার্থী এবং স্থানীয় রাখাইনদের মধ্যে বিদ্যমান হাজার বছরের পুরোনো সংঘাত নিরসনের চেষ্টা করেন এবং শরণার্থীদের পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেন কিন্তু কাজ পুরোপুরি শেষ করার আগেই তিনি মারা (১৭৯৯) যান। কক্সবাজার থানা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ সালে এবং পৌরসভা গঠিত হয় ১৮৬৯ সালে। কক্সবাজার জেলাটি ৯টি উপজেলা (ঈদ -গাঁও প্রস্তাবিতসহ), ৮টি থানা, ৪টি পৌরসভা, ৭১টি

ইউনিয়ন, ১৮৮টি মৌজা, ৯৯২টি গ্রাম এবং ৪টি সংসদীয় আসন নিয়ে গঠিত।

চট্টগ্রাম জেলার মতো কক্সবাজার জেলাও পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, উপত্যকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্যান্য জেলা থেকে স্বতন্ত্র। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৩৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩,৩৭৮ মিলিমিটার। উপকূলবর্তী এলাকা হওয়ায় এ জেলা প্রায়ই সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, হারিকেন, সাইক্লোন দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। কক্সবাজার শহরের আয়তন মোট ২৪ দশমিক ৪৫ বর্গ কি.মি. (৯ দশমিক ৪৪ বর্গমাইল) এবং চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৫২ কি.মি. দক্ষিণে আর ঢাকা থেকে এর দূরত্ব ৪১৪ কি.মি.। কক্সবাজার জেলায় বেশ কয়েকটি দ্বীপ ও বনাঞ্চল রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান প্রধান দ্বীপগুলো হলো মহেশখালী, কুতুবদিয়া, সোনাদিয়া, সেন্টমার্টিন (নারিকেল জিঞ্জিরা), শাহপরীর দ্বীপ, মাতারবাড়ী, ছেঁড়া দ্বীপ ইত্যাদি। এ ছাড়া বনাঞ্চলের মধ্যে রয়েছে ফুলছড়ি রেঞ্জ, ভোমরিয়াঘোনা রেঞ্জ, মেহেরঘোনা রেঞ্জ, বাঁকখালী রেঞ্জসহ চকরিয়া ও টেকনাফে রয়েছে ছোট বড় অনেক রেঞ্জ।

পর্যটনশিল্পকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে অনেক প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত অনেক হোটেল-মোটেল, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন নির্মিত মোটেল ছাড়াও সৈকতের নিকটেই বিশটি পাঁচতারা হোটেল রয়েছে। এ ছাড়া এখানে পর্যটকদের জন্য গড়ে উঠেছে ঝিনুক মার্কেট এবং সীমান্তপথে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে আসা বাহারি জিনিস -পত্রের দোকান নিয়ে গড়ে উঠেছে বার্মিজ মার্কেট। এখানে রয়েছে দেশের একমাত্র ফিস অ্যাকুরিয়্যাম। আরও আছে প্যারাসেলিং, ওয়াটার বাইকিং, বিচ বাইকিং, কক্স কার্নিভাল সার্কাস শো, ইনানী, হিমছড়ি, দরিয়া নগর ইকোপার্ক, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত অসংখ্য স্থাপত্য, ফিউচার পার্ক, শিশুপার্ক, কবিতা চত্বর, অসংখ্য ফটোশুট স্পট এবং সমুদ্রের লাবনী পয়েন্টেই নির্মিত হয়েছে নান্দনিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। এখানে আরও আছে টেকনাফ জিওলজিক্যাল পার্ক। রাতে উপভোগের জন্য রয়েছে নাইট বিচ কনসার্ট। সমুদ্র সৈকতকে লাইটিং এর মাধ্যমে আলোকিত করার ফলে এখানে রাতের বেলায় সমুদ্র উপভোগের সুযোগও রয়েছে। এখানে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সি-অ্যাকুরিয়্যাম, ক্যাবল কার এবং ডিজনিল্যান্ড। এ ছাড়া সমুদ্রের তীর ঘেষে টেকনাফ উপজেলার দিকে চলে গেছে মেরিন ড্রাইভ রোড। যার দ্বারা সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগের সুবিধা হয়েছে।

কক্সবাজার শহর ও এর অদূরে অবস্থিত রামুতে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বৌদ্ধমন্দির। এবং সেখানে ১০০ ফুট দীর্ঘ সিংহশয্যা বৌদ্ধ মূর্তিও রয়েছে। কক্সবাজার শহরে যে বৌদ্ধ মন্দিরটি রয়েছে তাতে বেশ কিছু দুর্লভ বৌদ্ধ -মূর্তি আছে। এই মন্দির ও মূর্তিগুলো পর্যটকদের জন্য অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে বিখ্যাত। এ ছাড়া হিন্দু ধর্মা -বলম্বীদের রয়েছে রামুতে 'রামকুট মন্দির', মহেশখালী-তে 'আদিনাথ মন্দির'। চকরিয়াতে বিশাল বনাঞ্চল জুড়ে রয়েছে 'বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক' এবং মাতামুহুরি নদীর তীরে রয়েছে 'নিভৃতে নিসর্গ' নামে বিনোদন স্থান। এ ছাড়া মহেশখালী মাতারবাড়ীতে তৈরি হচ্ছে কয়লা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং কুতুবদিয়ায় রয়েছে বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র। যা কক্সবাজার জেলাকে আরও নান্দনিক করে তুলেছে। এ ছাড়া জেলার বিভিন্ন জায়গা জুড়ে রয়েছে উল্লেখযোগ্য লবণ ও চিংড়ি মাছের চাষ। গৃহহীন মানুষের জন্য খুরুশকুলে সমুদ্র তীরে নির্মিত হয়েছে আশ্রয়ন প্রকল্প।

কক্সবাজারে কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বাস করে যা শহরটিকে করেছে আরো বৈচিত্র্যময়। তাদের মধ্যে চাকমা, মারমা ও রাখাইন সম্প্রদায় প্রধান। কক্সবাজার জেলার মানুষ সাধারণত চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে, তবে কথ্য ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে কক্সবাজার কেন্দ্রিক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিকভাবে এ অঞ্চলের মানুষের সাথে বর্তমান মায়ানমার (পূর্বে যাকে আরাকান নামে অভিহিত করা হত) এর সাথে ব্যাপক যোগাযোগের সম্পর্ক ছিল যা এখনও সীমিত আকারে হলেও অটুট রয়েছে। এ কারণে আরাকানের ভাষার কিছু কিছু উপাদান কক্সবাজারের কথ্য ভাষায় মিশ্রিত হয়ে গেছে। এখানে নৃ-তাত্ত্বিক রাখাইন জনগোষ্ঠী বসবাস করে। এদের ভাষার প্রভাবও স্থানীয় ভাষায় লক্ষ্য করা যায়।

সমুদ্র তীরবর্তী শহর হিসেবে কক্সবাজার জেলার সংস্কৃতি মিশ্র প্রকৃতির। পূর্ব হতেই বার্মার সাথে এখানকার মানুষের সম্পর্ক থাকায় এবং রাখাইন নামক নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বসবাস করায় কক্সবাজারে বাঙালী এবং বার্মিজ সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া চাকমারাও কক্সবাজার জেলায় বহু শতাব্দী ধরে বসবাস করে আসছে তারা মূলত উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলাতে বসবাস করে। কক্সবাজারের ঐতিহ্যবাহী চাকমারকূল ও রাজারকূল চাকমাদের স্মৃতি বহন করে। সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ায় এ অঞ্চলের মানুষ প্রাচীনকাল হতেই নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং উত্তাল সাগরের সাথে সংগ্রাম করে টিকে রয়েছে বিধায় স্থানীয় সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যম ও উপস্থাপনায় সংগ্রামের সেই চিত্র ফুটে ওঠে, বিশেষ করে জেলে সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবন।

রাজধানী ঢাকা থেকে সড়ক এবং আকাশপথে কক্সবাজার যাওয়া যায়। চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার অবধি রেললাইন স্থাপনের প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে অতি শীঘ্রই ঢাকা থেকে সরাসরি ট্রেন চলাচল শুরু হবে।

Photo Credit: gody.vn

সৌন্দর্যের রানি চট্টগ্রাম হোক আগামীর মিনি সিঙ্গাপুর

‘বালিয়াড়ি উড়ে উড়ে উড়ালে স্বপন
ঝাউবন শন্‌শন্ দিয়েছিল ডাক।
তুমি কিছু দিয়েছিলে অবিনাশী স্মৃতি
সৈকতে পড়ে আছে ঝিনুক যেমন’ – (সংগৃহীত)

রশীদ এনাম, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শহরগুলোর একটি চট্টগ্রাম, হরিকেল থেকে চট্টগ্রাম। ১৪০০ বছরের প্রাচীন শহর সৃষ্টিকর্তার তুলির স্পর্শে অপরূপা করে ঢেলে সাজিয়েছেন চট্টগ্রামকে। পাহাড়, নদী, দরিয়া নগরবেষ্টিত বন্দরনগরী চট্টগ্রাম। এই শহরের আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমিয়ে পড়ে। সবুজ অরণ্যানীতে নানা পশুপাখির অভয়ারণ্য। দেশের ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র, বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার, স্বৈরাচার আন্দোলন প্রত্যেকটি আন্দোলনের সূচনা কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে। মা, মাটি ও মাতৃভূমির জন্য মাস্টারদা সূর্যসেন ও প্রীতিলতার মতো আরও অনেক বীর চট্টগ্রামের কৃতী সন্তান, যাদের ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। আমাদের মাতৃভাষার ৪০ শতাংশ অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়া কিন্তু চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা থেকে উৎপত্তি। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, যিনি কি না পুঁথি সংগ্রহ করে দেশের সাহিত্যাঙ্গনকে অন্ধকার থেকে আলোকিত করেছেন। প্রথম আঞ্চলিক ভাষার অভিধান এবং আঞ্চলিক ভাষার চ্যানেলও চট্টগ্রাম থেকে শুরু। আমাদের রয়েছে নিজস্ব লোকজ সংস্কৃতি বলীখেলা, মেজবান, বেলা বিস্কুট, শুঁটকি, সাম্পান, মধুভাত। আমাদের রয়েছে একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদ। সিআরবি (চট্টগ্রাম রেলওয়ে বিল্ডিং বা বোর্ড) আমাদের শেকড় চট্টগ্রামে ঐতিহ্য ও নান্দনিক প্রাচীন স্থাপত্য প্রাকৃতিক হাসপাতাল, যাকে বলা হয় চট্টগ্রামের ফুসফুস। আমাদের আছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, পারকি বিচ, পতেঙ্গা বিচ, গন্ডামারা বিচ, ইকোপার্ক, সাজেক ভ্যালি ও বান্দরবান এবং রাঙামাটি। দেশের অর্থনৈতিক বৃহত্তম জোন মিরসরাই। এ জন্য বোধহয়

ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী (মোহন দাশ করম-চাঁদ গান্ধী) বাংলাদেশ সফর করতে এসে চট্টগ্রামকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছিলেন, Chittagong to the fore - চট্টগ্রাম সর্বত্রে এগিয়ে ।

শিল্প উদ্যোক্তা ব্যবসায়ও চট্টগ্রাম প্রথম। সমগ্র দেশে শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতিতেও চট্টগ্রামের মানুষ কিন্তু মেধার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস আমাদের সন্তান, মালয়েশিয়ার রূপকার ডক্টর মাহাথির মোহাম্মাদের পূর্বপুরুষ চট্টগ্রামের (সূত্র: *রিডার্স ডাইজেস্ট*, *দৈনিক পূর্বকোণ*)। সম্প্রতি চট্টগ্রামের মেয়ে শাহানা হানিফ মুনমুন আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের কাউন্সিলর হয়েছেন। দেশের অর্থনীতির সিংহভাগ আয়ও কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে আসে।

সম্প্রতি সৌন্দর্যের রানি আমাদের হ্যাভেনসিটি চট্টগ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরকার প্রায় ২ হাজার ৫শ কোটি টাকা, বরাইপাড়া খাল খননে ১ হাজার ৩শ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বারো আউলিয়ার পুণ্যভূমি গ্রিনসিটি চট্টগ্রাম নগরীর যানজট নিরসন, প্রত্যেকটি উপজেলা ও থানার সাথে দ্রুত যোগাযোগব্যবস্থায় মহাসড়কে উন্নয়ন, বাইপাস রোড স্থাপন, পতেঙ্গা থেকে বহদ্দারহাট পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার ফ্লাইওভার প্রকল্প, মহেশখালীর মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্রবন্দর, আউটার রিংরোড, কক্সবাজার পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে মেরিন ড্রাইভ হাইওয়ে, কক্সবাজারের রেললাইন নির্মাণও দৃশ্যমান, চলছে ঢাকা চট্টগ্রাম বুলেট ট্রেনের সম্ভাব্যতা যাচাই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ, ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম সমিতিকে হাসপাতালের জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার কখনো কৃপণতা করেনি। সব মিলিয়ে আগামীর চট্টগ্রাম হবে আরও সমৃদ্ধিশালী।

Photo Credit: gody.vn

বিউটিফুল বাংলাদেশ: আলো আঁধারে পর্যটনশিল্প ও তারুণ্যের তোলাপাঠ

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল বাংলাদেশের জন্য পর্যটনশিল্প যেন একটি মাইলফলক। কেননা, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে এ দেশের বুকে, যা বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণে রাখতে পারে ব্যাপক ভূমিকা।

মো. ফাহাদ হোসেন ফাহিম

শিক্ষার্থী, পশুপালন অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

'The world is a book and those who do not travel read only one page.' - St. Augustine

ভ্রমণ মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। শ্বাপদসমাকীর্ণ পৃথিবী হতে নগরসন্নিধি অভিমুখে যে যাত্রা, নগরকীর্তন সে গমনার্হে মানুষ বরণ করেছে অনেককিছু, বর্জনও করেছে বেশকিছু, তবে ভ্রমণ বা পর্যটনের বৃত্ত হতে বের হতে পারেনি মানুষ। দরিয়ানগরের সন্তান জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার আমন্ত্রণ, 'জগৎ অতিথি তুমি এসো এই ঘরে, পেতেছি বরণকুলা দরিয়ানগরে।' মাঠে তেপান্তরে শিল্পীর কণ্ঠে বাজে জীবনের বহুমাত্রিক সুর: 'বাংলাদেশের নদী মাঠ বেথুই বনের ধারে, পাঠিও বিধি আমায় বারে বারে'।

চমৎকার পর্যটনশিল্প সমৃদ্ধ আমাদের এই বাংলাদেশ ভ্রমণ যেন পরিব্রাজককে দেয় চিরল পাতার স্পর্শ, ষোড়শী কন্যার কেশের আলতো ছোঁয়া। তাই তো দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসা পর্যটক দলের ভাষ্য: ছবির মতো গণেশ্বরী, স্বর্গের মতো সবুজ দেশ, নদীর মাঝে ধাঁধার চর, স্বচ্ছ নদী রিক্রইং খিয়ং, কালাপাহাড় থেকে রেজুর মোহনা, সুন্দরবন থেকে পালংকি, নোনা কিংবা মিষ্টি জলের ডাকে জল জঙ্গলের কাব্য ও শিশিরভেজা সবুজ গালিচায় মাথা হেলিয়ে পর্যটক বলে: 'এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।' ৭ম শতকে বাংলা ভ্রমণকারী চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের স্বগতোক্তি, 'A sleeping beauty emerging from mists and water.'

পর্যটন হচ্ছে আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য ভ্রমণবিলাস যা বিনোদনমূলক, অর্থনৈতিক, ব্যবস্থাপনামূলক, সামাজিক, পরিবেশগত কিংবা হতে পারে বাণিজ্যিক। ভ্রমণকারীরাই পর্যটনশিল্পের প্রধানতম নিয়ামক।

১৯৬৭ সালে জাতিসংঘের ২১তম সাধারণ সম্মেলনে পর্যটনের গুরুত্ব সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পায় এবং সে বছরকে আন্তর্জাতিক পর্যটন বছর হিসেবে ঘোষণা করে বলা হয়, 'Tourism is a basic and most desirable human activity deserving the praise and encouragement of all people, and all Government.'

পর্যটনের মাধ্যমে একটি দেশের সাথে অন্য দেশ বা রাষ্ট্রসমূহের ভালো সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। পর্যটন না থাকলে মিশরের পিরামিড, চীনের রেশমী কাপড় থেকে কনফুসিয়াস, গ্রিক দর্শন, বিজ্ঞান কিংবা সাহিত্য, দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা থেকে সমরকন্দের মঙ্গোলীয় মানমন্দির, ব্যবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান, সুমেরীয়, ভারতীয়, পার্সি মহাকাব্য গিলগামেশ, রামায়ণ, মহাভারত, শাহনামা, পার্সেপোলিস থেকে মহেঞ্জোদারো বা আমাদের আজকের রান্নাঘরে মোগলাই পোলাও নামের খাবারটি পর্যন্ত যে সেই তাজিকিস্তান-উজবেকিস্তান হয়ে আসা, এসবই সম্ভব হয়েছে একমাত্র আন্তঃমহাদেশীয় ভ্রমণের মাধ্যমে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'ভবঘুরে শাস্ত্র' থেকে রবীন্দ্রনাথের 'জাপানযাত্রী' কিংবা বঙ্গবন্ধুর 'আমার দেখা নয়াচীন'-এর মতো পৃথিবীর যাবতীয় ভ্রমণসাহিত্যের পাঠ ও পাঠকের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিতে পারে প্রবলভাবে।

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল বাংলাদেশের জন্য পর্যটনশিল্প যেন একটি বিশেষ মাইলফলক। কেননা, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে এ দেশের বুকে, যা বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণে রাখতে পারে ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত যা অবিচ্ছিন্নভাবে ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ। রয়েছে একই সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অবলোকনের স্থান সমুদ্রকন্যা কুয়াকাটা, দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সবুজ রঙের নয়নাভিরাম চারণভূমি সিলেট, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতিসমৃদ্ধ উচ্চ সবুজ বনভূমি ঘেরা চট্টগ্রাম পার্বত্যাঞ্চল, কাপ্তাই লেক ও সবুজের সমারোহে বনভূমি ঘেরা রাঙামাটি, বান্দরবানের সাজেক ভ্যালিসহ আরও কত কিছু।

মোট দেশজ উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে সেবা খাতের অন্যতম অংশ পর্যটনশিল্পের। তাই আসুন বিউটিফুল বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পকে জাতীয় আয়ের প্রধানতম উৎসে পরিণত করতে করণীয় বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করি।

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন: পর্যটন একটি উৎপানদমুখী বিনিয়োগ ক্ষেত্র যেখানে নিট মুনাফাও সন্তোষজনক। তাই সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পর্যটন খাতে দেশি-বিদেশি, সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে।

খ. সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার: পর্যটন একটি লাক্সারিয়াস ডিমান্ড যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে সহাবস্থান ও সম্প্রীতির একটি সুষম পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব।

গ. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন: পর্যটন খাতের বিকাশে এখনো বাধা হয়ে আছে ভিসা জটিলতা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যর্থতা। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উৎকর্ষের জন্য সরকারিভাবে তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।

ঘ. আঞ্চলিক উন্নয়ন: পর্যটনশিল্পে এখনো বাধা হয়ে আছে অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, যোগাযোগের ঝুঁকি এবং পণ্যের বিপরীতে মাত্রাতিরিক্ত মূল্য আদায়ের প্রবণতা। যোগাযোগের ভোগান্তির কারণে আমরা ক্রমশই হারাচ্ছি বিদেশি পর্যটকদের। তাই এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে অবকাঠামোগত ও আঞ্চলিক উন্নয়ন কাজে হাত বাড়াতে হবে।

ঙ. পরিবেশগত উন্নয়ন: পর্যটনের সবুজ স্বর্গ বাংলাদেশে আজকে পর্যটনকেন্দ্রগুলো দূষিত ও ধ্বংস হচ্ছে নির্বিচারে। দূষিত হচ্ছে নদী, কাটা পড়ছে গাছ, পাহাড়, জঙ্গল কিংবা হারিয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। তাই স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশের পাশাপাশি পরিবেশগত উন্নয়ন ব্যতীত এ শিল্প থেকে আয়ের আশা যেন কুমিরের সান্নিপাত।

চ. পর্যটনশিল্প-তাত্ত্বিক কাঠামো: নাগরিক জীবনের বহুবিধ অনিশ্চয়তা ও জলবায়ু নামক খ্যাপা জন্তুর প্রহরণের ভেতর দিয়ে আমাদের টিকে থাকার সবেধন নীলমণি হতে পারে পর্যটনশিল্প। তাই পর্যটন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা, অধ্যয়ন ও প্রচারণার মাধ্যমে আমাদের পর্যটনশিল্পের তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

ছ. তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার: পর্যটনশিল্পের প্রচারণা, গবেষণা, নিরাপত্তা, বিশ্লেষণসহ বহুমাত্রিক কাজে তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই আয়ের উৎস বিনির্মাণে তথ্য প্রযুক্তির প্রসার যেন অবশ্য কর্তব্য।

ঝ. প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধি: পর্যটনে ধর্মব্যবসায়ীদের বাধা ও অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ঞ. পর্যটন আকর্ষণ বৃদ্ধি ও সচেতনতা: ম্যাল-এর নিড থিওরিতে পর্যটনের অবস্থান তৃতীয় ফেজে। শিক্ষার সাথে পর্যটনের সম্পর্ক বেশ নিবিড়। নিজ দেশের ঐতিহাসিক নিদর্শন, গঠন বৈচিত্র্য, প্রাণী ও উদ্ভিদ, সামাজিক কৃষ্টি-কালচার, সম্পদ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের পর্যটন আকর্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

তাই পর্যটনশিল্পকে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত করতে উত্তম যোগাযোগব্যবস্থা, আইনের শাসন, সামাজিক নিরাপত্তা, থাকা খাওয়ার উন্নত ব্যবস্থা, বৈচিত্র্যময় বিনোদন সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আর তার সাথে প্রয়োজন আলো আঁধারে নিমজ্জিত পর্যটনশিল্পে তারুণ্যের তোলাপাঠ, তারুণ্যের অংশগ্রহণ। বাংলাদেশের এই শিল্পের বিকাশে তারুণ্যের তোলাপাঠ হতে পারে নিম্নরূপ:

ক. পর্যটনবিষয়ক নীতিগুলোতে যুব প্রতিনিধিদের অংশ-গ্রহণ ও যৌক্তিক মতামত প্রদান করা।

খ. নিরাপদ পর্যটন ও বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি-মালা প্রণয়নে এগিয়ে আসা ও সরেজমিন কাজ করা।

গ. পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে তরুণ সমাজের সম্পৃক্ততা এবং ভোক্তা সমিতি, বণিক সমিতি ও পরিবেশবাদী সংগঠনকে সাথে নিয়ে যুবসমাজের কর্মপরিসর বৃদ্ধি করা।

ঘ. বহুমাত্রিক পর্যটনশিল্প রূপান্তরে গণসচেতনতার লক্ষ্যে নিরাপত্তা বলয় গঠন করা এবং নারী পর্যটন উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে সাহায্য করা।

ঙ. পর্যটনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং পর্যটনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে জনসচেতনতা -মূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

চ. দুর্যোগপ্রবণ, দুর্গম অঞ্চল এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব দিয়ে জীবনচক্রব্যাপী টেকসই পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে সম্পৃক্ততা যাচাই করা।

ছ. প্রয়োজনে পর্যটন প্রশিক্ষণ, সহযোগিতামূলক প্রকল্প গ্রহণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাজারব্যবস্থা সুনিশ্চিতে কাজ করা।

জ. জ্ঞানভিত্তিক পর্যটন আন্দোলন গড়ে তোলা, নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে পর্যটনের অর্থনৈতিক মূল্য ফিরিয়ে আনা, পরিবেশ ও পর্যটন সুরক্ষা আন্দোলনগুলো আর্থিক ও সামাজিকভাবে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো।

ঞ. পর্যটনশিল্প বিকাশে পেশাদারিত্ব থাকা প্রয়োজন, পেশাদারিত্ব থাকলে বিদেশিরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে।

সবশেষে বলতে চাই সাম্প্রতিককালে উদীয়মান বিপ্লবের প্রধান ধারা হচ্ছে বৈশ্বিক অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন। এই ধারা অব্যাহত রাখতে বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ধাপ পূরণে পর্যটনব্যবস্থা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অল্প কয়েক দশক ধরে বিশ্বের অর্থনীতিতে 'পর্যটন' শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং তা বর্তমানে দ্রুত বিকাশ লাভ করে চলেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পর্যটনশিল্পকে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় সহজ শর্তে ও স্বল্প ব্যয়ে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। বিশ্বে শান্তি এবং বন্ধুত্ব স্থাপনের একটি প্রধান এবং উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে পর্যটনশিল্পকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তাই পর্যটন খাতের সমস্যাগুলো দূর করে একে আরও আকর্ষণীয় ও লাভজনকভাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি বর্তমানে এ দেশে পর্যটনকে শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শেষ করছি এই বলে, সমৃদ্ধির আলোয় প্রদীপ্ত হলে পর্যটন ভূমি, তবেই বাঁচব তুমি আমি।

Photo Credit: Wikipedia

কোভিড-১৯ পরবর্তী পর্যটন ভাবনা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যটন

উন্নয়ন ব্যতিরেকে যেমন সফলতা সম্ভব নয়, তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি করেও গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য প্রয়োজন সাসটেইনেবল পদ্ধতিতে গ্রামীণ পর্যটন তথা গ্রামীণ উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা। কারণ গ্রামের উন্নয়ন হলেই দেশের উন্নয়ন হবে, সুফল পাবে সমগ্র জাতি।

মোঃ ইকবাল সরোয়ার

সহযোগী অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পর্যটন একধরনের বিনোদন, অবসর অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থান কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করা বোঝায়। বিশ্বব্যাপী অবসরকালীন কর্মকান্ডের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পর্যটনশিল্প বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মূলত যিনি আমোদ প্রমোদ বা বিনোদনের জন্য অন্যত্র ভ্রমণ করেন তিনি পর্যটক নামে পরিচিত। পর্যটনের সাথে বিভিন্ন ধরনের সেবা খাত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। বিশ্বের প্রায় ১৫০ কোটি মানুষ এক দেশ থেকে অন্যদেশ ভ্রমণ করেন, অর্থাৎ প্রতি সাত জনের মধ্যে একজন পর্যটক (ইউএনডব্লিউটিও, ২০২০)। পর্যটকেরা নতুন জায়গা, সংস্কৃতি, খাদ্য ও নতুন অভিজ্ঞতার জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়, এটাই পর্যটনের ধর্ম। ১৯৭০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন সংস্থার বার্ষিক সম্মেলনে এর নাম, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় এবং তখন থেকে 'বিশ্ব পর্যটন সংস্থা' (ডব্লিউটিও) নামে চিহ্নিত করার বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালের বার্ষিক সম্মেলনে এই সংস্থা গঠনের দিনে বিশ্বব্যাপী পর্যটন দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয় এবং তখন থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে।

২০১৯ সালের জুলাই পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী পর্যটক আগমনের সংখ্যা ছিল ১৪০১ মিলিয়ন। এর মধ্যে ২০১৯ পর্যন্ত এশিয়া ও প্যাসিফিক মহাসাগরীয় দেশে পর্যটক আগমনের সংখ্যা ছিল ৩৪৮ মিলিয়ন (ইউএনডব্লিউটিও, ২০২০)।

সাম্প্রতিক সময়ে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে পর্যটক আগমনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি (৭.৩% হারে) পেয়েছে (ডব্লিউটিটিসি, ২০১৯)। পৃথিবীর অনেক দেশ শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ঘটিয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হচ্ছে। কারণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ জাতীয় অর্থনীতিতে রয়েছে পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এ ছাড়া পর্যটনশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বিশ্ব জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান ১১ শতাংশ (ইকোনোমিক ইমপ্যাক্টস রিপোর্ট, ২০২০), কিন্তু করোনার প্রভাবে মে'২০২০ পর্যন্ত পর্যটন খাতে ক্ষতির পরিমাণ ২.১ ট্রিলিয়ন ডলার (ডব্লিউটিটিসি, ২০২০)। করোনা মহামারিজনিত কারণে পর্যটনশিল্পের বিপর্যয় কতদিন স্থায়ী হবে তা নির্ভর করছে এই ভাইরাস কখন নির্মূল হবে তার উপর। আর পর্যটকদেরও সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চত করে পূর্বের মতো ভ্রমণে আগ্রহী হতে অনেক সময় লাগতে পারে। কারণ মানুষের মনোজগতে করোনার প্রভাব দীর্ঘদিন বিদ্যমান থাকবে যা মানুষকে ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করতে পারে। এখন ভ্রমণে আগ্রহীরা স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা চিন্তা করেই ভ্রমণ পরিকল্পনা করবে। তাই বিশাল একটা সংকটে পড়তে পারে পর্যটন-শিল্প।

করোনা ভাইরাসে থমকে যাওয়া বিশ্বের অর্থনীতিকে বিকশিত করতে পর্যটনশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। করোনা পূর্ববর্তী সময়ের ন্যায় পর্যটনের বিকাশ অব্যাহত থাকলে সবক্ষেত্রেই কম-বেশি পর্যটন সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ২০২২ সালে বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পণা সম্পন্ন হওয়ার কথা। এই মহাপরিকল্পণায় করোনা মহামারি পরবর্তী বিষয়াবলী ও চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের জিডিপিতে পর্যটনশিল্পের অবদান ২ শতাংশ, যা করোনা মহামারি পরবর্তী সময়ে ধরে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ জন্য এখনই সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ বাংলাদেশে ছোট-বড় যে আট শতাধিক পর্যটনস্থান রয়েছে সবগুলোই এখন স্থবির। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের হিসেবে, করোনা ভাইরাসের কারণে পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রায় ৪০ লাখ মানুষ জীবন-জীবিকা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছে এবং আয় বন্ধ হওয়ায় তাদেও ওপর নির্ভরশীল প্রায় দেড় কোটি মানুষ কঠিন বিপদে রয়েছে। টোয়াব (২০২০) এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর কারণে ভ্রমণ ও পর্যটন খাতে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫ হাজার ৭শ কোটি টাকা।

বিশ্বের অন্যতম পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশ একটি ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিকভাবে অপার সম্ভাবনার দেশ। বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক, জীববৈচিত্র, সুন্দরবন, কক্সবাজার, চারু ও কারুশিল্প, মনোরম পার্বত্য সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধ নৃগোষ্ঠী এই অঞ্চলের ব্যাপক পর্যটক আকর্ষণের অন্যতম ক্ষেত্র। তাছাড়া আমাদের দেশের গ্রামীণ উন্নয়নেও পর্যটন খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশের সৌন্দর্য যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের বিশাল সংখ্যক পর্যটক আকর্ষণ করা যাবে। পর্যটনের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন হলে দেশের ৭০ ভাগ গ্রামে বসবাসকারী মানুষ তাদের জীবনমান পরিবর্তনে এই খাতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে পারে। এই বিশাল সংখ্যক মানুষকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সচেতন করে তুলতে পারলে তারাও গ্রামীণ পর্যটনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

পর্যটনশিল্পকে বাংলাদেশ সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করে জাতীয় শিল্প নীতি-২০১০ এ পর্যটনশিল্পকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে মূল্যায়ন করেছে, এছাড়া জাতীয় পর্যটন নীতিমালা-২০১০ প্রণয়ন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিষ্ঠা, এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোন গঠন ও কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম উন্নয়ন, ইকো-ট্যুরিজম, হোটেল মোটেল ও যোগাযোগ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

করোনা পরবর্তী গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধার ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনের আর্থিক সচ্ছলতাসহ স্থায়ী উপার্জনের পথ সুগম হয়। গ্রামীণ পর্যটন আকর্ষণে আমাদের ঐতিহ্য অনেক সমৃদ্ধ। যেমন বাংলাদেশে রয়েছে কৃষির ঐতিহ্যবাহী চাষ পদ্ধতি, জুমচাষ, লোকসংগীত, মৌচাষ, চিরায়ত পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ, দেশীয় খাবার দিয়ে আপ্যায়ণ। এসব বিষয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারলে গ্রামীণ পর্যটন প্রসারের পাশাপাশি বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে এবং একই সাথে গ্রামীণ উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। ইকোট্যুরিজম, ফার্মিং, সবুজ ও টেকসই পর্যটনের মাধ্যমে কোভিড-১৯ পরবর্তী বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

গ্রামবাংলার প্রকৃত দৃশ্যাবলী তথা নদীর সৌন্দর্য, খাল-বিল-হাওর, দেশীয় মৎস্য ও পশুপাখিসহ গ্রামীণ জীববৈচিত্রের মাধ্যমে ইকোট্যুরিজম ঢেলে সাজানো যেতে পারে। অন্যদিকে ফার্মিংট্যুরিজমের মাধ্যমে স্বকীয় কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি, সেচ পদ্ধতি, ফসল উত্তোলন পদ্ধতি, গ্রামীণ নারীদের কর্মপদ্ধতি, পশুপালন ও রেশম চাষ পদ্ধতি অন্যতম আকর্ষণ হতে পারে। আবার সবুজের আচ্ছাদন ও টেকসই প্রকৃত গ্রামীণ পর্যটনের অন্যতম

আদর্শ স্থান হতে পারে বাংলাদেশ। ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যপূর্ণ এই দেশ সবসময়ই মন জুড়ানো সবুজ শ্যামল গ্রামীণ জনপদকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা গেলে কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশাল সংখ্যক বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করা যেতে পারে। কারণ উন্নত বিশ্বের বরফ আচ্ছাদিত অনেক দেশের পর্যটক সবুজের সমারোহ দেখতে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে, অবশ্য এ জন্য প্রয়োজন যথাযথ উদ্যোগ এবং প্রচারণা।

উন্নয়ন ব্যতিরেকে যেমন সফলতা সম্ভব নয়, তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি করেও গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য প্রয়োজন সাসটেনেবল পদ্ধতিতে গ্রামীণ পর্যটন তথা গ্রামীণ উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা। কারণ গ্রামের উন্নয়ন হলেই দেশের উন্নয়ন হবে, সুফল পাবে সমগ্র জাতি। কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য টেকসই ও সুনিয়ন্ত্রিত গ্রামীণ পর্যটন পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রশাসন ও পর্যটকসহ সবার দায়িত্ব গ্রামীণ পর্যটনকে বাঁচিয়ে রাখতে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। এ জন্য আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্যগুলোকে নান্দনিকভাবে বিদেশি পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণের চেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যটন। এ জন্য ছোট ছোট গ্রামীণ পর্যটন উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া যেতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যটনকে কাজে লাগিয়ে বেকারত্ব ও দারিদ্র দূরীকরণের দিকে যথাযথ দৃষ্টি দিলে সত্যিকার অর্থেই দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

Photo Credit: getyourguide.com

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে পর্যটন খাত: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বর্তমানে যে হারে পর্যটনশিল্পের অগ্রগতি হচ্ছে, সেইসাথে বাড়ছে না এই শিল্পে কাজ করার মতো দক্ষ জনবল। ফলে এই শিল্পে কাজ করার মতো যোগ্য জনবলের অনেক স্বল্পতা দেখা দিচ্ছে। আগামী কয়েক বছরে হোটেল ব্যবস্থাপনায় দক্ষ অন্তত ২৫ থেকে ৩০ হাজার জনবলের প্রয়োজন হবে।

জাহিদ হাসান, শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানে যেকোনো দেশের পর্যটনশিল্প সেই দেশের জন্য একটি লাভজনক শিল্প। অথচ কয়েক দশক আগেও পর্যটনকে শিল্প হিসেবে কল্পনা করা যায়নি। সময়ের পরিক্রমায় পর্যটন বা ট্যুরিজম আজকের পৃথিবীতে একক বৃহত্তম শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। পরীক্ষিত, প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত পরিসংখ্যান বলছে যে, পর্যটন অন্যান্য আরও ১০৯টি শিল্পকে সরাসরি প্রভাবিত করে। বর্তমানে পর্যটন খাত বৈশ্বিক জিডিপিতে প্রায় ১১ শতাংশ অবদান রাখছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে বিশ্বে পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন।

বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনা: পর্যটকদের মুগ্ধ করার জন্য আমাদের রয়েছে বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ পর্যটন সম্ভার। পর্যটন সম্পদ বিবেচনায় বাংলাদেশকে বলা হয় ইউনিক ডেল্টা অব সেভেন টিএ (ট্যুরিজম অ্যাট্রাকশনস)। এই সেভেন টিএ হচ্ছে নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বন, ইতিহাস -ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, ঋতু বৈচিত্র্য এবং আতিথেয়তা। যদি কোনো স্থানে বা কোনো দেশে এই সেভেন টিএ এর একটি উপস্থিত থাকে, তাহলে পর্যটনের জন্য তাকে বলা হয় 'গুড', যদি দুটি থাকে তাকে বলা হয় 'বেটার', আর যদি দুইয়ের অধিক থাকে তবে বলা হয় 'বেস্ট'। সেই বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে 'বেস্ট প্লাস'। ফোর্বস ম্যাগাজিনের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালে পর্যটন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে শীর্ষ দশটি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল প্রথম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান ৩ দশমিক ০২ শতাংশ, যেটি প্রায় ৭৭ হাজার কোটি টাকার মতো। দেশের পর্যটনশিল্পে প্রায় ৪০ লাখ জনশক্তি নিয়োজিত। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে পর্যটন হতে পারে এক মোক্ষম হাতিয়ার। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মূলকথা হলো সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকলের জন্যই সুযোগ সৃষ্টি করা এবং জীবনমান উন্নয়ন করা।

অর্থনীতিতে পর্যটন খাত: একজন পর্যটকের আগমনে সেবা খাতে ১১ জন মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়। পরোক্ষভাবে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয় আরও ৩৩ জনের। ১ লাখ পর্যটকের আগমনের সাথে ১১ লক্ষ কর্মসংস্থান যুক্ত। কোনো স্থানে যদি ১০ লাখ নিয়মিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যটক থাকে, সেখানে স্থায়ী কর্মসংস্থান হয় ১ কোটি ১০ লাখ। ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশে এটি আরো ব্যাপক হতে পারে। কারণ এই জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই হচ্ছে তরুণ ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর।

স্বল্প বিনিয়োগে অধিক লাভ এনে দেওয়া পর্যটনশিল্প পৃথিবীজুড়ে চলতি দশকের সবচেয়ে দ্রুতবর্ধনশীল শিল্পের মর্যাদা পেয়েছে। মালয়েশিয়ার জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্প বছরে অবদান রাখছে প্রায় ২ হাজার কোটি ডলার। নেপালের জাতীয় আয়ের ৪০ শতাংশের উৎস পর্যটন খাত। এ ছাড়াও সিঙ্গাপুরের জাতীয় আয়ের ৭৫, তাইওয়ানের ৬৫, হংকংয়ের ৫৫ এবং থাইল্যান্ডের ৩০ শতাংশ পর্যটনের অবদান। পর্যটন ব্যতিক্রমধর্মী একটি রপ্তানি বাণিজ্য। অন্যান্য বাণিজ্যে বিদেশে পণ্য প্রেরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হয়। কিন্তু পর্যটনের ক্ষেত্রে বিদেশিদের দেশ ভ্রমণে আকৃষ্টকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সেবা ও সুবিধা প্রদান করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়। পর্যটনে বিদেশি পর্যটক নিজের দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণে এসে থাকা-খাওয়া, যাতায়াত, বিনোদনে যে অর্থ ব্যয় করে তা অপর দেশের বৈদেশিক মুদ্রারূপে অর্জিত হয়। পরিসংখ্যান বলছে, অন্যান্য রপ্তানির তুলনায় পর্যটনশিল্প থেকে আয়ের পরিমাণ দ্রুত বর্ধনশীল এবং লাভজনক হওয়ায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি বা মোট দেশজ উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এই সেবা খাতের। তাছাড়া এই শিল্পের ব্যয় কম হওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি পূরণেও বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ধারণায় পর্যটন: গ্রামীণ পর্যটন ধারণাটি পর্যটন সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণাগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে এবং একটি নির্দিষ্ট দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতপূর্বক গ্রামীণ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত সুস্থতা বয়ে আনতে পারে। গ্রামীণ পর্যটনের হাত ধরে গ্রামীণ জীবনে উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জোয়ার এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির উত্তরণের একটা বিশাল সুযোগ আছে।

আমাদের অধিকাংশ পর্যটন আকর্ষণ দেশের প্রান্তিক এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় গ্রামীণ পর্যটনের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। পর্যটন একটি শ্রমঘন শিল্প, তাই এই শিল্পে দক্ষ এবং অদক্ষ উভয় ধরনের শ্রমিকেরই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে পর্যটনশিল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির দিক থেকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ খাত হিসেবে স্থান দখল করে নিয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির অগ্রগতির ক্ষেত্রেও অন্যান্য শিল্পের চেয়ে পর্যটন খাতের অগ্রগতি প্রায় দেড় গুণ বেশি। তাছাড়া এই শিল্পের কর্মকান্ড দেশের আনাচে-কানাচে পরিচালিত হওয়ায় গ্রামীণ মানুষেরই বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করতে ক্ষুদ্রঋণের চেয়েও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে গ্রামীণ পর্যটন। পর্যটনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকায় গ্রামীণ নারীদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি মাধ্যম হতে পারে এই গ্রামীণ পর্যটন।

একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলকে পর্যটন অঞ্চলে রূপান্তরের মাধ্যমে সেই অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ কতটা বদলে দেওয়া সম্ভব, সেটার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো: মিঠামইন-ইটনা-অষ্টগ্রাম উপজেলার সংযোগকারী অবিশ্বাস্য অল-ওয়েদার সড়কটি। এর প্রভাবে গোটা হাওরের দৃশ্যপটে এসেছে আমূল ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই সড়ক পুরো হাওর অঞ্চলের যোগাযোগব্যবস্থার ক্ষেত্রেই শুধু পরিবর্তন আনেনি, গোটা হাওরের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে। হাওরবাসীর জীবনে এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। প্রতিদিন হাজারও পর্যটকের পদচারণায় এখন মুখরিত হাওরের একসময়ের অত্যন্ত অবহেলিত আর প্রত্যন্ত এই জনপদ। পর্যটকদের ব্যাপক আগমনের ফলে এই অঞ্চলের দরিদ্র, বেকার তরুণ-যুবকদের কর্মসংস্থানের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। অনেক তরুণ মোটরবাইক, ইজিবাইকসহ বিভিন্ন যানবাহন চালিয়ে যাত্রী পরিবহনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছেন। পেশাদার মাঝিরা নৌকা, ট্রলার ও স্পিডবোটের মাধ্যমে পর্যটকদের গভীর হাওরে পরিভ্রমণ করিয়ে অর্থ উপার্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। এ ছাড়া যোগাযোগব্যবস্থা সহজ হয়ে যাওয়ায় পণ্য পরিবহনের খরচ আগের তুলনায় অনেক কমেছে। ফলে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সহজলভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে এবং মূল্যও ক্রয়সীমার মধ্যে চলে এসেছে। ইটনা-অষ্টগ্রাম সদরে দুই শতাধিক অস্থায়ী হোটেল, রেস্তোরাঁ, খাবারের দোকান স্থাপিত হওয়ায় কয়েকশ পরিবারের রুটিরুজির ব্যবস্থা হয়েছে। সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় হাওরের এসব অবকাঠামো দেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এসডিজি বাস্তবায়নে অন্যতম মাধ্যম হতে পারে পর্যটন খাত। জাতিসংঘ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে যে ১৭টি লক্ষ্যের কথা বলেছে, তার মধ্যে ৮, ১২ ও ১৪ নম্বর সরাসরি পর্যটনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাকি ১৪টিও কোনো না কোনোভাবে পর্যটনসংশ্লিষ্ট। তাই এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পর্যটনের বিকাশ দারুণ সহায়কের ভূমিকা রাখতে পারে।

পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে তরুণদের ভূমিকা: বাংলাদেশের অনেক তরুণ বর্তমানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর চাকরির

পেছনে না ছুটে সম্ভাবনাময় পর্যটন খাতে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং এ হার ক্রমেই বাড়ছে। বর্তমানে দেশের সরকারি-বেসরকারি ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৬৮৫টি অনার্স-মাস্টার্স কলেজে চার বছর মেয়াদী ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু আছে। ফলে ট্যুরিজম বিষয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে দেশে একটি প্রাতিষ্ঠানিকতার চর্চা গড়ে উঠেছে।

অনেক তরুণ ট্রাভেল এজেন্সি গড়ে তুলেছেন। তারা নতুন নতুন পর্যটন আকর্ষণ খুঁজে বের করছেন এবং সেগুলোকে জনপ্রিয় করে তুলছেন। অনেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিনিয়োগ করে অবকাশ কেন্দ্র, রেস্তোরাঁ ও প্রমোদতরী চালু করেছেন। অথচ তাদের অধিকাংশের শুরুটা হয়েছিল ফেসবুকে ছোট একটি গ্রুপ খোলার মাধ্যমে। সময়ের পরিক্রমায় তারা এখন ট্রাভেল বিজনেসে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পাহাড়ে নতুন নতুন পথ বা ঝরণা খুঁজে বের করা, এগুলোর উৎস অনুসন্ধান করা, দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে কোনো গন্তব্যে যাওয়া, প্রতিকূল পরিবেশে তাঁবু গেঁড়ে দিন-রাত্রি যাপন, নানা ধরণের দুঃসাহসিক বা একটু ঝুঁকি-পূর্ণ কাজ, যার মধ্যে একটা অভিযানে বের হওয়ার আনন্দ বা রোমাঞ্চ আছে, সেগুলো করার ব্যাপারেই বর্তমানের তরুণ পর্যটকদের আগ্রহ বেশি। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের হিসেব অনুযায়ী, বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে যারা দেশের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান, তাদের প্রায় ৪০ শতাংশই তরুণ।

আমাদের দেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালে রয়েছে। ইউএনডিপির এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে তরুণ জনগোষ্ঠীর দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ অর্থাৎ ১০ কোটি ৫৬ লাখ লোক এখন কর্মক্ষম। এমন সুযোগ কোনো জাতির জীবনে একবারই আসে। এই সুযোগটি আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের উচিত পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তরুণ-তরুণীদের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করা।

বর্তমানে যে হারে পর্যটনশিল্পের অগ্রগতি হচ্ছে, সেই সাথে বাড়ছে না এই শিল্পে কাজ করার মতো দক্ষ জনবল। আগামী কয়েক বছরে হোটেল ব্যবস্থাপনায় দক্ষ অন্তত ২৫ থেকে ৩০ হাজার লোকের প্রয়োজন হবে। তাই তরুণদের পর্যটন বিষয়ে পড়াশোনা করতে আরও বেশি আগ্রহী করে তুলতে হবে এবং এই তরুণেরাই আগামী দিনে পর্যটনশিল্পে নেতৃত্ব দেবে।

পর্যটন খাতকে অনেক বেশি এগিয়ে নিতে কিছু সুপারিশ: বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প একটি উদীয়মান শিল্প। বিগত কয়েক বছরে পর্যটনশিল্পের ব্যাপক উন্নতি চোখে পড়ার মতো। পর্যটনকে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত করতে বিশেষ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। যেমন:

* বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতে ডেডিকেটেড পর্যটনবান্ধব অফিসার নিয়োগ দেওয়া এবং সেসব দূতাবাসে পর্যটনবিষয়ক পোস্টার, ডিসপ্লের ব্যবস্থা রাখা।

* বাংলাদেশের পর্যটন নিয়ে বহির্বিশ্বে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিতে সচেষ্ট থাকতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

* বাংলাদেশের সবগুলো পর্যটনস্পট আমরা এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি। তাই দেশের অভ্যন্তরে নতুন নতুন পর্যটন গন্তব্য চিহ্নিত করার কাজটি অব্যাহত রাখা এবং সেই স্থানের অবকাঠামো নির্মাণ, যোগাযোগব্যবস্থা উন্নয়ন, বিনোদনব্যবস্থা সৃষ্টির সাথে সাথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

* পর্যটনের খাতের প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করতে হবে।

* পর্যটনস্থানগুলোর জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে পর্যটন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য ইকো-ট্যুরিজমের ওপর বেশি নজর দিতে হবে, যাতে সেই সকল এলাকার পর্যটন দীর্ঘস্থায়ী হয়। যেমন: সুন্দরবন, সেন্টমার্টিন, রাতারগুল, সাজেক প্রভৃতি।

* আমাদের এয়ারপোর্টগুলো যাত্রী/পর্যটকবান্ধব এবং আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করতে হবে। বিদেশি পর্যটকবৃন্দ এয়ারপোর্টে কোনো ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হলে দ্বিতীয়বার তারা বাংলাদেশে আসবে না।

* প্রচলিত ট্যুরিজমের পাশাপাশি হাওর ট্যুরিজম, রিলিজিয়াস ট্যুরিজম, হালাল ট্যুরিজম, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম, নদী পর্যটনের প্রচলন করতে হবে। বর্তমান সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে আমরা অতি সহজে হালাল ট্যুরিজম প্রবর্তন করতে পারি।

* এ ছাড়া পর্যটন খাত সংক্রান্ত যথাযথ পলিসি প্রবর্তন, অবকাঠামো উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পর্যটন গন্তব্যে পরিষেবা ও সুযোগ-সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

Photo Credit: getyourguide.com

সীমাবদ্ধতা দূরে ঠেলে পর্যটনে প্রসারিত হোক দেশের সীমা

আমরা বিবিসি, সিএনএন, ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যসহ প্রাকৃতিক রূপ অবলোকন করে থাকি। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশের তেমন প্রচার নেই বললেই চলে।

নাসরীন গীতি, লেখক ও সাংবাদিক

অপরূপ রূপের প্রাকৃতিক সম্ভারপূর্ণ বাংলাদেশে রয়েছে পর্যটনের অসংখ্য উপাদান। বিস্তীর্ণ পাহাড়-পর্বত, বর্ণাঢ্য জনজীবন ও বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন, দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, কুয়াকাটাসহ হ্রদ, নদ-নদী, চা-বাগান, প্রাচীন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে ভরপুর বাংলা মায়ের কোল। এই রূপের হাতছানিতেই ছুটে আসে সৌন্দর্য পিপাসু দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। এত মায়াময় বঙ্গভূমির রূপে মুগ্ধ হয়ে কবি-সাহিত্যিকরাও তাঁদের লেখায় তুলে এনেছেন রূপসী বাংলাদেশকে। কবি লিখেছিলেন, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।' আবার কারও কাছে এই দেশ ছবির মতো।

অতীতেও বাংলার প্রাকৃতিক শোভা আর সম্পদের টানে ছবির মতো এই দেশে ছুটে এসেছেন বিদেশি পর্যটকরা। মানুষের একে অপরকে জানার আগ্রহ থেকেই পর্যটনের বিকাশ ঘটেছে। হয়তো পর্যটনের নামে নয়, কিন্তু পর্যটন বিষয়টি অনেক প্রাচীন। মার্কো পোলো, ইবনে বতুতা, ভাস্কো-দা-গামা, কলম্বাস, ক্যাপ্টেন কুক, ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাংসহ বিশ্ববিখ্যাত পর্যটকরা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য, কেউ কেউ অজানা ভূখণ্ডকে আবিষ্কারের জন্য ভয়কে তুচ্ছ করে দেশ-বিদেশে ছুটে বেরিয়েছেন। অচেনা পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন বলেই অনেক অজানা পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি কিংবা অনেক ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় আধুনিক যুগেও পর্যটন এক অন্যরকম রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যুগে যুগে ভ্রমণকারীরা মুগ্ধ হয়েছেন। এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবং বাংলাদেশের অপার সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে দেশকে শতভাগ পর্যটনমুখী করা দুরূহ কিছু নয়। নতুন করে কৌশল ঠিক করে সম্ভাবনার সবটুকুকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে পর্যটনে মডেল দেশ হতে পারে।

বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও, বিদ্যমান বৈচিত্র দিয়ে সহজেই পর্যটকদের আকর্ষণ করা যায়। পৃথিবীতে পর্যটনশিল্প আজ বৃহত্তম শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। পর্যটনশিল্পের বিকাশের ওপর বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন অনেকখানি নির্ভর করছে। দেশে পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটলে কর্মসংস্থান ঘটবে ও বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা সফল হবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস ও শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রথার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঐতিহাসিক স্থান দেখার জন্যও পর্যটকরা নিজ দেশের সীমানা পেরিয়ে ছুটে চলে প্রতিনিয়ত। পর্যটনশিল্পের বহুমাত্রিকতার কারণে বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনা তৈরি হয়। সৃষ্টি হয় ব্যাপক কর্মসংস্থানের।

কিন্তু বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের সমূহ সম্ভাবনা থাকলেও বিভিন্ন কারণে এ দেশের পর্যটনশিল্পকে প্রকৃত শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা যায়নি। এর মূল কারণ হচ্ছে, পর্যটনশিল্প বিকাশে বাংলাদেশের যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত অসুবিধা। এখনও অনেক মনোহরী স্পটে সহজ যোগাযোগব্যবস্থা তৈরি করা যায়নি। নিরাপত্তাও অপ্রতুল। অথচ আমাদের শুধু প্রাকৃতিক মনোহরী স্পটই নয়, বিশেষ সময়ে উৎসব-পার্বণ উদযাপনেও আগ্রহ আছে বিদেশি পর্যটকদের। পহেলা বৈশাখ, ফেব্রুয়ারির বইমেলা, দোল পূর্ণিমাসহ অনেক আয়োজনে ব্যাপক আগ্রহী দেশ-বিদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পর্যটক।

তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটন এমনই এক অর্থনৈতিক খাত যেখানে প্রচুর বিনিয়োগ না করেও বিপুল আয় করা সম্ভব। পর্যটনের জন্য তেমন নতুন কিছু সৃষ্টি করতে হয় না। শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরণকে রূপান্তরের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করলেই চলে। পর্যটনস্পটগুলোকে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করলেই এ খাতে বিপুল আয় করা সম্ভব। বিশ্বের অনেক দেশ আছে যাদের জাতীয় আয়ের বিরাট অংশই পর্যটন খাত হতে আসে।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের পর্যটন-শিল্পের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পর্যটন-শিল্পকে নতুনভাবে তুলে ধরতে উদ্যোগী হয় সরকার। বাংলাদেশের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বেকারত্ব বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৭ নভেম্বর জারিকৃত রাষ্ট্রপতির ১৪৩ নং আদেশ বলে, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পর্যটন সম্ভাবনাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, এবং ১৯৭৫ সালে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে নবগঠিত মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেওয়া হয়।

জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের বিকাশ, পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন, পর্যটকদের সেবা প্রদান, বিদেশে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও দেশের পর্যটন সম্পদের বিকাশের পাশাপাশি এ শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গনে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা।

বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণগুলোকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়। যথা:
ক. প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক পর্যটন;
খ. রোমাঞ্চকর ভ্রমণ এবং পরিবেশভিত্তিক পর্যটন;
গ. সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যটন;
ঘ. ধর্মীয় পর্যটন;
ঙ. নৌ পর্যটন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্প নানাভাবে অবদান রাখতে পারে। প্রথমত, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বাংলাদেশে এমনিতেই রপ্তানি কম। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের কোনো খাতই তেমন শক্তিশালী নয়। এই প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলে পর্যটনের মতো 'অদৃশ্য রপ্তানি পণ্য' খাতে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারে। বাংলাদেশ সরকার পর্যটন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সুনাম অর্জনে বিরাট অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ ২ বছরের জন্য (২০০১-২০০৩) বিশ্ব পর্যটন সংস্থার কমিশন ফর সাউথ এশিয়ার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বাণিজ্যিক কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি পর্যটনশিল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ১৯৭৪ সালে জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। এ পর্যন্ত এখানে পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ৬০ হাজারের বেশি প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে সুনামের সাথে দেশ-বিদেশে কাজ করছেন।

পর্যটনশিল্পের উন্নতির সঙ্গে যেসব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হতে পারে সেগুলো হল:

১. ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বেকারত্ব লাঘব;
২. প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন;
৩. কুটির শিল্প ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন;
৪. বৈচিত্রময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি;
৫. অবকাঠামো ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন;
৬. বৈদেশিক বিনিয়োগ;
৭. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো অনেক সম্ভাবনাময় শিল্প হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ নানা কারণে পর্যটনশিল্পে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হলো অবকাঠামোগত দুর্বলতা। এই খাতের অবকাঠামো মারাত্মকভাবে দুর্বল। পরিবহনব্যবস্থা মান্ধাতার আমলের। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি সত্ত্বেও এখনও রয়েছে অনেক দুর্বলতা। পর্যটনস্পট সংলগ্ন রাস্তাঘাট সংকীর্ণ, যানজটে অযথা সময় ও শক্তি নষ্ট হয়। পর্যাপ্ত আধুনিক হোটেল ও মোটেল নেই। অনেক পর্যটন কেন্দ্র সুপরিকল্পিত আধুনিকায়ন হয়নি। পর্যটন এলাকায় শুল্কমুক্ত বিপণির অভাবও দেখা যায়। উন্নত সেবা ও তথ্যের অভাব হচ্ছে পর্যটন-শিল্পের অগ্রগতিতে বাধাদানকারী আরেকটি নেতিবাচক উপাদান। দক্ষ, মার্জিত জনবলের অভাব এ শিল্পের একটা বড় সমস্যা। সেই সঙ্গে রয়েছে উন্নত ও দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থার অভাব। যদিও বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে এ সমস্যা অনেকটাই দূর হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত স্থানে ভ্রমণের আগেই সেই স্থানের ভালো-খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে জানতে পারছে।

আমাদের পর্যটন খাতে আকৃষ্ট হয়ে বিদেশি পর্যটকরা আসেন। কিন্তু বিপত্তি ঘটে যখন তারা সামাজিক বাধার মুখে পড়েন। তাঁদের সংস্কৃতিকে এ দেশে অনেকেই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেন না। অনেকেই তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুষ্টু লোকের পাল্লায় পড়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি নানা রকম হয়রানির শিকারও হন।

আমরা বিবিসি, সিএনএন, ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রকৃতির রূপ অবলোকন করে থাকি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তেমন প্রচার নেই বললেই চলে। প্রামাণ্যচিত্র, লিফলেট, প্রচারপত্র বা এই জাতীয় নানা ধরনের কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের পর্যটন-শিল্পের কথা তুলে ধরার মাধ্যমে আরো প্রসার ঘটানো সম্ভব। বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে। এই শিল্পের বিকাশে আরও প্রয়োজন:

১. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পর্যটনস্পটগুলোকে আরও মনোমুগ্ধকর করে তোলা;
২. যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা তথা বিমান, নৌ ও সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন;
৩. নিরাপদ ভ্রমণের যাবতীয় ব্যবস্থাকরণ;
৪. দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি পর্যটনশিল্পের বিকাশের জন্য চাই স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা। আকর্ষণীয় এলাকাগুলোর পরিকল্পিত নান্দনিক উন্নয়ন যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন পর্যটন-কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ।

সরকারি অনুদান ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে যথাযথ সমন্বয় সাধন করার পাশাপাশি উন্নত অবকাঠামো, সঠিক পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অবস্থা পর্যটনের উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পর্যটনশিল্পের উপাদান ও ক্ষেত্রগুলো দেশে ও বিদেশে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে পর্যটনশিল্পের অধিকতর বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

Photo Credit: getyourguide.com

পর্যটনশিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জোরালো ভূমিকা প্রয়োজন

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পকে পুনরায় উজ্জীবিত করতে বড় অঙ্কের প্রণোদনা প্যাকেজসহ সরকারের বিভিন্ন এজেন্সির সহযোগিতা জরুরি হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পর্যটনশিল্পে প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান নিশ্চিত করতে হবে।

রেজাউল করিম খোকন
সাবেক উপ-মহাব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিঃ

করোনাকালীন ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারসহ অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সরকার বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের অর্থনীতির জন্য বড়সড় ধাক্কা হয়ে আসে করোনা মহামারি। করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি দেশীয় পর্যটনশিল্পেও চরম স্থবিরতা নেমে এসেছিল। এর ফলে বাংলাদেশের পর্যটন খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশের পর্যটনশিল্পে হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, ট্যুর অপারেটর, বিনোদন কেন্দ্র, এভিয়েশন, ক্রুজ শিপসহ প্রায় ১১৫টি উপখাত রয়েছে। মহামারির কারণে এসব খাতে ক্ষতির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা। এমনিতেই নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে আমাদের পর্যটনশিল্পকে পথ চলতে হচ্ছে। করোনা শুরু হওয়ার আগে থেকেই বিভিন্ন কারণে পর্যটন-শিল্প পিছিয়ে ছিল। তারপরও যতটুকু ব্যবসা ছিল, তাতেও টিকে থাকতে তেমন সমস্যা হয়নি। কিন্তু করোনা শুরুর পর লকডাউন ও বিভিন্ন বিধিনিষেধের কারণে দেশের সব পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ ছিল দীর্ঘসময়। বার বার হোঁচট খেতে খেতে আমাদের পর্যটনশিল্প বিপর্যয়ের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ খাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেবলই বেড়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই একই অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। তেমন পরিস্থিতিতে আমাদের পর্যটন খাতকে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হচ্ছে সামনের দিকে।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের পর পর্যটনশিল্প হতে পারে রাজস্ব আদায়ের বিরাট সম্ভাবনাময় খাত। আর সেই সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই সরকার পর্যটন খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে পর্যটনশিল্পের সর্বোচ্চ বিকাশে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। পর্যটনশিল্পের

সর্বোচ্চ বিকাশে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। পর্যটনশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে এ দেশের প্রায় ৫০ লাখ মানুষ। অনেক প্রতিকূলতা, সীমাবদ্ধতা, সমস্যা, সংকট, ত্রুটি-বিচ্যুতি, পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও পর্যটন খাত থেকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছে বাংলাদেশ। অভ্যন্তরীণ পর্যটনের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে বাংলাদেশে। সাধারণ মানুষ এখন ছুটির দিনগুলোতে পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব নিয়ে দেশের বিভিন্ন পর্যটনস্পটে বেড়াতে যাচ্ছেন। এখন বিভিন্ন উৎসবে, ছুটির দিনে দেশের জনপ্রিয় পর্যটনস্পটগুলো পর্যটকের ভিড়ে দারুণ জমজমাট হয়ে ওঠে। ওই সময়ে সেখানকার হোটেল, মোটেল, কটেজগুলোতে থাকার জন্য রুম খালি পাওয়া যায় না। কয়েক মাস আগে থেকেই মোটেল রিসোর্টগুলোর সব রুম বুকিং দিয়ে রাখতে হয়। যদি পর্যটনস্পটগুলোতে হোটেল, মোটেল, রিসোর্টের সংখ্যা বাড়ে তাহলেও সেখানকার ভিড় কমবে না। সুপরিকল্পনা, দক্ষ সম্পদব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দেশের পর্যটনশিল্প উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হবে, আশা করা যায়। পর্যটন ব্যবসায় নিয়োজিত উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী ট্যুর অপারেটরেদের দাবি, এ খাতে আরো সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে সরকার, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নানামুখী উদ্যোগ নিতে হবে। পর্যটনশিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী অনেক উদ্যোক্তা যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজির অভাবে মাঝপথে থেমে আছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের পর্যটন খাতে আয় প্রায় ৭৬ দশমিক ১৯ মিলিয়ন ডলার, যা সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় অপ্রতুল। প্রয়োজনে আর্থিক সহযোগিতা যেমন, ব্যাংকঋণ পেলে তারা তাদের পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারবে।

পর্যটন ব্যবসায় নিয়োজিত উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, ট্যুর অপারেটরদের দাবি, করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটনশিল্পকে পুনরায় উজ্জীবিত করতে এ খাতে সরকারের পক্ষ থেকে আরও সুযোগ-সুবিধা দিতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পর্যটন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সহযোগিতা ও ঋণ প্রদানের নানা স্কিম গ্রহণের মাধ্যমে এ খাতকে আরও এগিয়ে নিতে বিশেষ ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের দাবি উঠেছে। এ খাতের বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন পর্যটনস্পটগুলোতে আরও হোটেল, মোটেল, কটেজ, রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট তৈরি হতে পারে। ব্যাংকঋণ নিয়ে গড়ে তোলা যেতে পারে আকর্ষণীয় ট্যুরিস্ট স্পট। যেখান থেকে আয় হতে পারে বিপুল পরিমাণ অর্থ। লাভজনক এবং পরিবেশবান্ধব এই শিল্পে বিনিয়োগের অনেক সুযোগ থাকলেও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এ খাতে অংশগ্রহণ এখনও উল্লেখ করার মতো অবস্থায় পৌঁছায়নি।

দেশের পর্যটন খাত নিয়ে গর্ব করা যায়। তবে সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এ খাতকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হয় বলে এ খাতে আর্থিক বিনিয়োগ সব সময়েই সংকুচিত রাখা হয়। ফলে পর্যটন খাতে ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগের মাত্রা সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাংকগুলো যদি পর্যটন খাতের জন্য বিশেষ সঞ্চয় স্কিম, আলাদা ঋণদানের মাধ্যমে হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় বিনিয়োগের বিশেষ প্যাকেজ চালুর উদ্যোগ নেয় তাহলে এ খাতে সমৃদ্ধি ঘটতে পারে দ্রুত। আমাদের প্রতিবেশি এবং সার্কভুক্ত দেশ নেপাল পর্যটন খাতে আকাশ ছোঁয়া সাফল্য অর্জন করেছে। তাদের পর্যটন খাতের বিশাল সাফল্যের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে নেপাল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড। এটাকে পর্যটন খাতের জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক বলা চলে। খুব বেশি দিন আগে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই নেপালের পর্যটনশিল্পে রক্ত সঞ্চার করে চলেছে নেপাল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড।

ওখানকার সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যখন পর্যটন খাতে আর্থিক বিনিয়োগকে ঝুঁকিপূর্ণ ভেবে সংকুচিত অবস্থায় ছিল তখন প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন এই বিশেষায়িত ব্যাংক। বিশেষ সঞ্চয়ী প্রকল্প চালুর মাধ্যমে পর্যটন খাতকে সহায়তা করা, হোটেল-মোটেল, কটেজ, রিসোর্ট প্রতিষ্ঠা, ক্রয়, সংস্কার, পুনঃসজ্জিতকরণ, আধুনিকায়নে ঋণ বিতরণ এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যবসায় গ্যারান্টি প্রদানে নেপাল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড কাজ করে যাচ্ছে। যার অনুকূলে প্রভাব নেপালের পর্যটন খাতে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। নেপালের মতো ভারতেও পর্যটন খাতে আর্থিক সহযোগিতার জন্য রয়েছে ট্যুরিস্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া। যা ভারতের পর্যটন-শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য, সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

নেপাল এবং ভারতের মতো বাংলাদেশে পৃথক কোনো পর্যটন ব্যাংক চালু না করেও প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় পর্যটনশিল্পের বিকাশে আমাদের ব্যাংকগুলো নতুন বিনিয়োগ করতে পারে। পর্যটনে যাওয়ার জন্য আগ্রহীদের বিশেষ সঞ্চয় স্কিম, এ ব্যবসায় নিয়োজিতদের জন্য বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্প চালু থেকে শুরু করে এ খাতে উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ঋণের মতো আলাদা ঋণদান কর্মসূচি প্রচলন করা যায়। পর্যটনভিত্তিক বিশেষায়িত ব্যাংক ছাড়াও আরও একটি বিকল্প ব্যবস্থা হলো–

বাংলাদেশে প্রচলিত সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো যদি পর্যটনশিল্পের বিকাশে নতুন শাখা তৈরি করে বিনিয়োগ করে তাহলে তা পর্যটনশিল্পকে নতুন একটি রূপ দিতে সক্ষম হবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ শিল্পের উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ঋণের মতো আলাদা ঋণদান কর্মসূচি প্রচলন করতে পারে।

দেশের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় পর্যটনকেন্দ্র ও স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিশেষ ট্যুরিজম ব্যাংকিং উইন্ডো চালু করতে পারে। নতুন নতুন হোটেল, মোটেল নির্মাণ, কটেজ, রিসোর্ট ও অ্যামিউজমেন্ট পার্ক প্রতিষ্ঠা, পর্যটনস্পটগুলোতে অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যবসায়িক সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিশ্লেষণ করে বিনিয়োগ উপযোগী মনে হলে ট্যুরিজম ব্যাংকিং উইন্ডো চালু করার মাধ্যমে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। আগ্রহী উদ্যোক্তারা এ ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে পর্যটন-শিল্পে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পারেন। দেশের অভ্যন্তরে পর্যটকদের চলাচলে সুবিধার জন্য বিভিন্ন এয়ারলাইনসকে নানা ধরনের আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া যায়, যাতে করে তারা তাদের সেবার পরিধি ও মান বৃদ্ধি করতে পারে। বিলাসবহুল বাস, ট্যুরিস্ট কোচ ও জাহাজ আমদানির লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো যথাসম্ভব জটিলতা পরিহার করে সহজ শর্তে ট্যুরিস্ট অপারেটরদের পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করতে পারে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে মুদ্রা বিনিময়ের জন্য সার্বক্ষণিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ব্যবস্থা, যথেষ্ট সংখ্যক এটিএম বুথ স্থাপন এবং এগুলো সার্বক্ষণিক চালু রাখা নিশ্চিতকরণ, ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন সুবিধা বৃদ্ধি করাসহ দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ হেল্পডেস্ক চালু করার মাধ্যমে ব্যাংকগুলো পর্যটন খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। পর্যটন খাতকে ঝুঁকিপূর্ণ খাত মনে না করে একে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচনা করে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিনিয়োগে উদ্যোগী হলে পর্যটন ব্যবসায় নিয়োজিতরা বিশেষভাবে লাভবান হবেন।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যটন খাতের সম্ভাবনাময়, লাভজনক প্রকল্প খুঁজে বের করে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানসহ অন্যান্য বিনিয়োগ প্যাকেজ চালু করলে আগামী কয়েক বছরে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের চেহারা অনেকটাই বদলে যেতে পারে। যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজির অভাবে দেশের বিভিন্ন আকর্ষণীয় পর্যটনস্পট গড়ে উঠতে পারছে না আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক মানের হোটেল-মোটেল, রেস্টুরেন্ট ও বিনোদন কেন্দ্র। অনেক উদ্যোক্তা এ ধরনের প্রকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ প্রত্যাশা করলেও নানা ধরনের আইনগত জটিলতা, ঋণ নীতিমালার দোহাই দিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা এবং আন্তরিকতার অভাব সুস্পষ্ট। অথচ সম্ভাব্যতা যাচাই করে পর্যটনশিল্পে নানামুখী উদ্যোগে প্রয়োজনীয় আর্থিক বিনিয়োগ করে ব্যাংকগুলো যথেষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে পারে। আর এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়াগায় গড়ে উঠতে পারে আকর্ষণীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র। এর ফলে বাংলাদেশের রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে ভিন্নমাত্রা সংযোজনের পাশাপাশি পর্যটনশিল্পে বিপুল সংখ্যায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) অংশ হিসেবে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো যে অর্থ ব্যয় করে, তার একটি অংশ দেশের পর্যটন খাতের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে, এই মর্মে সিএসআর ব্যয় নীতিমালা সংশোধন করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক যা খুবই প্রশংসনীয়। নিয়ম অনুযায়ী, একটি ব্যাংকের মোট বার্ষিক মুনাফার আড়াই শতাংশ সিএসআর-এ খরচ করতে হয়। পর্যটন খাতকে চাঙ্গা ও উন্নত করতে স্পেশাল ট্যুরিজম ব্যাংকিং কর্মসূচি চালুর ব্যাপারে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পর্যটন ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যদি আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করা যায়, তাহলে সম্ভাবনাময় পর্যটনশিল্পকে আরো সমৃদ্ধ ও উন্নত করা সম্ভব।

একুশ শতককে বিশ্বব্যাপীই পর্যটনের স্বর্ণ সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে। কোনো সম্ভাবনাময় শিল্পকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বাহন হিসেবে নিতে হলে তার বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার দরকার। ডব্লিউটিটিসির গবেষণা মতে, বিশ্বের ১৮৪টি পর্যটন সমৃদ্ধ দেশের মধ্যে বাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৬০ নম্বরে। দশ বছর পর বাংলাদেশ ১৮তম অবস্থানে চলে আসবে। ফলে জাতীয় আয়ে বড় অবদান রাখবে এ শিল্প। এ জন্য দরকার পর্যটনশিল্পে দ্রুত বিনিয়োগ। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কাজ করতে হবে সবাইকে।

অবকাঠামো, যোগাযোগব্যবস্থা, ইকো-সিস্টেম, আবাসস্থল, মানসম্মত খাদ্য, নিরাপত্তা ও ইমেজ বৃদ্ধি করা গেলে দেশে পর্যটক আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং এ খাত থেকে অধিক রাজস্ব আয় অর্জন সম্ভব হবে। বাংলাদেশ সরকার পর্যটনশিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নকে গতিশীল করতে বহু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। করোনা-পরবর্তী দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকার ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। সম্প্রতি সরকার পর্যটনশিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ও বিকাশের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের লক্ষ্যে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এ শিল্পের উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যটন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে।

২০২৫ সালের মধ্যে পর্যটনশিল্পের সর্বোচ্চ বিকাশে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সরকার। পুরো দেশকে আটটি পর্যটন জোনে ভাগ করে প্রতিটি স্তরে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রথমবারের মতো সরকারি-বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের পর্যটন খাতের আয় প্রায় ৮০ মিলিয়ন ডলার। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের ৫১টি দেশের পর্যটক বাংলাদেশ ভ্রমণ করবে, যা মোট জিডিপিতে ১০ শতাংশ অবদান রাখবে। লাভজনক এবং পরিবেশবান্ধব এই শিল্পে বিনিয়োগের অনেক সুযোগ থাকলেও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ খাতে অংশগ্রহণ এখনো উল্লেখ করার মতো অবস্থায় পৌঁছেনি। তাই সম্ভাবনাময় পর্যটনশিল্পকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ ব্যাংকিং সেবা চালু এবং আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। কেননা, বাংলাদেশ পর্যটনশিল্পে যদি আরো উন্নত হয় তাহলে তা অর্থনীতিতে এবং মোট জিডিপিতে বিপুল পরিমাণে অবদান রাখতে পারবে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি বাংলাদেশ হাতছানি দেয় বিদেশি পর্যটকদের। কিন্তু বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প এখনও অবকাঠামোগতভাবে অনেকটা পিছিয়ে আছে আমাদের প্রতিবেশি অন্যান্য দেশের চেয়ে। প্রয়োজনীয় আর্থিক বিনিয়োগ পর্যটনশিল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনাময় খাত ও যোগ্য অভিজ্ঞ দক্ষ উদ্যোক্তা নির্বাচন করে যদি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পৃথক উইন্ডোর মাধ্যমে বিশেষ ব্যাংকিং সেবা প্রদানে উদ্যোগী হয় তাহলে বিনিয়োগকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ তা ফেরত পাওয়ার কার্যকর কলাকৌশল নির্ধারণ করতে হবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে। এসএমই খাতের মতো ব্যাংকগুলো পর্যটন খাতে বিশেষ ব্যাংকিং সেবা পণ্য চালুর মাধ্যমে আগ্রহী উদ্যোক্তা গ্রাহকদের সহযোগিতা করতে পারে। নতুন নতুন হোটেল-মোটেল, কটেজ ও বিনোদন-কেন্দ্র স্থাপন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত স্থানে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ মনোরম রিসোর্ট গড়ে তোলা, উন্নতমানের রেস্টুরেন্ট চালুর লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো যদি আলাদা ঋণদান কার্যক্রম শুরু করে তবে আগ্রহী উদ্যোক্তার অভাব হবে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যটনশিল্পের জন্য বিশেষ ব্যাংকিং সেবা চালুকরণের ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যদি আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে, তাহলে সম্ভাবনাময় পর্যটনশিল্পকে আরও সমৃদ্ধ ও উন্নতকরণের মাধ্যমে জিডিপিতে এর বিপুল পরিমাণ অবদান বাড়ানো সম্ভব। পর্যটন খাতকে চাঙ্গা ও উন্নত করতে স্পেশাল ট্যুরিজম ব্যাংকিং কর্মসূচি চালুর ব্যাপারে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলে জাতীয় অর্থনীতিতে শুভ ফলাফল বয়ে আনতে পারে। দেশীয় অর্থনীতিতে পর্যটনের অবদান প্রায় ৩ শতাংশ। যার মূখ্য অংশ অভ্যন্তরীণ পর্যটন থেকে আসে। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পকে পুনরায় উজ্জীবিত করতে বড় অংকের প্রণোদনা প্যাকেজসহ সরকারের বিভিন্ন এজেন্সির সহযোগিতা এ ক্ষেত্রে জরুরি হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পর্যটনশিল্পে প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান নিশ্চিত করতে হবে। পর্যটনের বিভিন্ন উপখাতের ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠানকে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী ঋণ প্রদানে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। পর্যটন উপখাতে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ঋণের পরিমাণ নিরূপণ করে তা প্রদানে আন্তরিক এবং উদ্যোগী হতে হবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে।

Photo Credit: Abdul Momin

পর্যটনশিল্পে বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য

বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যে দেশ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক এবং আত্মিক, সকল সম্পদেই সমৃদ্ধ। এ কারণে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে পর্যটকদের আগমন ঘটছে।

শামস সাইদ, কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

প্রকৃতির সৌন্দর্যের গভীরে তাকাও তাহলে তুমি সবকিছু আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

– আলবার্ট আইনস্টাইন

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক লীলা নিকেতন। রয়েছে উঁচুনিচু পাহাড়, সুনীল সাগর, অবারিত মাঠ, সুবিস্তৃত সুনীল আকাশ, যা এক অপূর্ব চিত্তহারী সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। এখানে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন আর দীর্ঘতম অখণ্ড সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রামের অকৃত্রিম সৌন্দর্য, সিলেটের সবুজ অরণ্যসহ আরও অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমুদ্রসৈকতের চেয়ে কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কক্সবাজারকে কেন্দ্র করে নেওয়া হচ্ছে নানা উদ্যোগ। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সাগরের পাড়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দেবে।

সুন্দরবনের ৬০ শতাংশ অর্থাৎ ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ ভারতে। সুন্দরবন ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে বনের জীববৈচিত্র্য পৃথিবীর অন্য যে কোনো পর্যটনকেন্দ্র থেকে স্বতন্ত্ররূপে উপস্থাপন করেছে। এই বনকে জালের মতো জড়িয়ে রেখেছে সামুদ্রিক স্রোতধারা, খাল, শতশাখা নদী, কাদার চর এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমির লবণাক্ততাসহ ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপমালা। সুন্দরবনের নামের সঙ্গে যেই বিষয়টি নিবিড়ভাবে জড়িত, তা হলো বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বনভূমিটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও নানা ধরনের পাখি, চিত্রা হরিণ, কুমির, ডলফিন ও সাপসহ অসংখ্য প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল পর্যটনের জন্য একটি অপার সম্ভাবনাময় অঞ্চল, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে অধিক পরিচিত। মূলত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এলাকা, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান নিয়ে গঠিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটনের মূল আকর্ষণ পাহাড়ে ঘেরা সবুজ প্রকৃতি যা সময়ের সাথে নতুন রূপে পর্যটকদের কাছে ধরা দেয়। এটি যেন ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির রূপ বদলের খেলা। এখানে শীতে যেমন এক রূপ ধরা দেয় ভ্রমণপিপাসুদের কাছে, বর্ষা হাজির হয় অন্য রূপে। শীতে পাহাড় কুয়াশা আর মেঘের চাদরে যেমন ঢাকা থাকে, তার সঙ্গে থাকে সোনালি রোদের মিষ্টি আভা। বর্ষায় চারদিক জেগে ওঠে সবুজের সমারোহে। মেঘ নেমে আসে পাহাড়ের মাথায়। হাত বাড়ালেই যেন ছুঁয়ে দেওয়া যায়। প্রকৃতি ফিরে পায় নতুন যৌবন। বর্ষায় মূলত অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিস্টদের পদচারণা বেশি থাকে পার্বত্য অঞ্চলে।

মহেশখালীর দক্ষিণ পশ্চিমে বালির ছোট্ট দ্বীপ সোনাদিয়া। দূর থেকে প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিন্সের মতো মনে হয়। কিন্তু সোনাদিয়ার সৌন্দর্য আলাদা। পাহাড়, সবুজ ঘন প্যারাবন পেছনে ফেলে বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে পা রাখতে হয় সোনাদিয়ার বুকে। ঐতিহাসিকরা একে সোনালী দ্বীপ বলেছেন। শীতের সময় এর সৌন্দর্য পায় নতুন রূপ। কারণ, হাজার হাজার অতিথি পাখি এই দ্বীপকে দখল করে ফেলে। তাই কেউ কেউ অতিথি পাখির স্বর্গরাজ্যও বলে থাকেন।

বাংলাদেশের একমাত্র সামুদ্রিক প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিন্স। টেকনাফ থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে এর অবস্থান। এই দ্বীপের লম্বা ইতিহাস আছে। জিঞ্জিরা, দক্ষিণ পাড়া, গলাছিরা ও চেরাদিয়া এই চারটি দ্বীপ নিয়ে 'সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপ' গড়ে উঠেছে। এ দ্বীপের মূল আকর্ষণ সামুদ্রিক কাঁকড়া, কাছিম, প্রবাল, মুক্তা আর বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, যা পর্যটকদের স্বাদে ও সৌন্দর্যে বিমোহিত করে। এখানে আছে জীবন্ত পাথরও।

এই দ্বীপ থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে গেলেই পর্যটক পেয়ে যাবেন বাংলাদেশের মানচিত্রের সর্বদক্ষিণের শেষ বিন্দু, যেখানে অবস্থান ছেঁড়াদ্বীপের। সেন্টমার্টিন থেকে ট্রলার বা স্পিডবোটে আধা ঘণ্টায় পৌঁছানো যায়। এখানে বসতি নেই। পুরো সংরক্ষিত এলাকা। চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রবাল-শৈবাল, শামুক-ঝিনুক। স্বচ্ছ নীল জলের এই দ্বীপে দেখা মেলে নানা বৈচিত্র্যের মাছেরও।

কক্সবাজার থেকে মেরিন ড্রাইভ সড়ক ধরে ১০ কিলোমিটার গেলেই পাহাড়ঘেরা অপরূপ 'হিমছড়ি'। মেরিন ড্রাইভ সড়কে সমুদ্র আর পাহাড়ের মধ্যদিয়ে গাড়িতে অনায়াসে উপভোগ করে আসা যায় প্রবাহমান ঝর্ণাধারার হিমছড়ি। পাহাড় চূড়ায় ওঠার জন্য রয়েছে কয়েকশ ফুট উঁচু পাকা সিঁড়ি। পাহাড়ের মাথায় দাঁড়ালে মনে হবে সাগরের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। হিমছড়ি যাওয়ার আগে রয়েছে 'দরিয়া নগর' পর্যটনপল্লী। হিমছড়ি থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে গেলেই পাথুরে সৈকত ইনানী। বিশাল সাগরের জলরাশি যখন বীর বিক্রমে পাথরগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, মুগ্ধ বিস্ময়ে চোখ সরাতে পারবেন না পর্যটকরা। কারণ, এই সৈকতে ঐশ্বর্যের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শামুক, ঝিনুক আর নানা রঙের পাথরের বাহার তখন শৈল্পিক হয়ে ওঠে। এই পাথরস্তূপের কারণেই সৈকতের নাম হয়েছে পাথুরে সৈকত।

সমুদ্র ছেড়ে এবার গহীন অরণ্যে ভালুক, সিংহ, অজগরসহ নানা জীবজন্তু দেখতে হলে ডুলাহাজারায় বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে চলে যেতে পারবেন। এর মধ্যে দেশি-বিদেশি বন্য প্রাণীর বংশবৃদ্ধি ও অবাধ বিচরণের সুযোগ রয়েছে, রয়েছে শিক্ষা, গবেষণা ও চিত্ত-বিনোদনের সুযোগ। ৯০০ হেক্টরের এই সাফারি পার্কের অবস্থান চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পূর্ব পার্শ্বে ডুলাহাজারায়।

কুতুব উদ্দীন আউলিয়ার নামে কক্সবাজারে রয়েছে দ্বীপ কুতুবদিয়া। এ দ্বীপটি পরিচিত প্রাচীন একটি বাতিঘরের জন্য। সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য ১৮২৮ সালে নির্মিত হয়েছিল এ বাতিঘরটি। টিপ টিপ জ্বলা আলো দিয়ে সমুদ্রের জাহাজগুলোকে বর্তমানে পথ না দেখালেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে। এ দ্বীপের অন্যান্য দর্শনীয় স্থান হলো কুতুব আউলিয়ার মাজার, শাহ আব্দুল মালেক মহিউদ্দিনের (রহ.) দরগা শরিফ।

কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম ছেড়ে পর্যটকরা সিলেটের দিকে পা বাড়ালেই আবার হারিয়ে যাবে অপরূপ দৃশ্যে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর সিলেটে রয়েছে উপমহাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ চা বাগান মালনীছড়া চা বাগান। এ অঞ্চলে আসা পর্যটকদের মন জুড়ায় সৌন্দর্যের রানীখ্যাত জাফলং, নীলনদখ্যাত স্বচ্ছ জলরাশির লালাখাল, পাথর জলের মিতালিতে বয়ে যাওয়া বিছনাকান্দির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, পাহাড় ভেদ করে নেমে আসা পাংথুমাই ঝরনা, সোয়াম্প ফরেস্ট রাতারগুল, 'মিনি কক্সবাজার' হাকালুকি এবং কানাইঘাটের লোভাছড়ার সৌন্দর্য। এসব এতটাই বৈচিত্র্যময় যে পর্যটকদের আকড়ে রাখবে।

বাংলাদেশের হাওর অঞ্চল খুলে দিয়েছে পর্যটনের আরেক সম্ভাবনার দুয়ার। সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, সিলেট, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এ সাতটি জেলার ৭ লাখ ৮৪ হাজার হেক্টর জলাভূমিতে ৪২৩টি হাওড় নিয়ে হাওরাঞ্চল গঠিত। হাওরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকরা নৌকায় বসে বিস্তীর্ণ নীল জলরাশির মায়ায় ভেসে বেড়াতে পারবে। হাওরের কোল ঘেঁষে থাকা সীমান্ত নদী, পাহাড়, পাহাড়ি ঝরনা, হাওড়-বাঁওড়ের হিজল, করচ, নল-খাগড়া বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পর্যটকদের মাতিয়ে রাখবে। নদীপথগুলো নতুন রূপে সেজে ওঠে যা দেখার জন্য বহু পর্যটক ভিড় করেন। এর সঙ্গে আছে পাহাড়ের মানুষের ভিন্নধর্মী জীবনাচরণ যা

পর্যটনশিল্পে অপার সম্ভাবনাময় দেশ বাংলাদেশ। প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্য পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে অনন্য ও একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ায় পর্যটন বিকাশে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে বিশাল সম্ভাবনা। এটা কোনোভাবেই অবহেলা করা ঠিক হবে না। পর্যটনকে আরও বেশি গণমুখী করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। সেই সঙ্গে বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণও বাড়াতে হবে।

বিগত ৭০ বছরে পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৫০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যটকের সংখ্যা বাড়লে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধিও ব্যাপকতা লাভ করে। পর্যটনের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়ে থাকে।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থার প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২২ সাল নাগাদ পর্যটনশিল্প থেকে প্রতিবছর ২ ট্রিলিয়ন ডলার আয় হবে। ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের ৫১টি দেশের পর্যটকেরা বাংলাদেশে ভ্রমণ করবেন, যা মোট জিডিপির ১০ শতাংশ অবদান রাখবে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালে মোট কর্মসংস্থানের ১ দশমিক ৯ শতাংশ হবে পর্যটনশিল্পের অবদান। পর্যটনশিল্পের অপার সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার রোল মডেল।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পর্যটকের সংখ্যা ১০০ কোটিরও বেশি। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৫ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১৬০ কোটি। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিপুল সংখ্যক পর্যটকের প্রায় ৭৩ শতাংশ ভ্রমণ করবেন এশিয়ার দেশগুলোতে। বাংলাদেশ যদি এ বিশাল বাজার ধরতে পারে তাহলে পর্যটনের হাত ধরেই বদলে যেতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতি।

এই অঞ্চলে ভারত এবং শ্রীলঙ্কার পর্যটন আয় বেশি, কারণ তাদের পরিকল্পিত চিন্তাভাবনা। ছোট রাষ্ট্র যেমন হংকং, সিঙ্গাপুর, ম্যাকাও, মালদ্বীপ, ফিজি পর্যটন খাত থেকে প্রচুর আয় করে শুধু বিদেশিদের আনাগোনার জন্য। এসব দেশে পর্যটন অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার খাত। পর্যটকের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি ব্যাপকতা লাভ করেছে। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যে দেশ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক এবং আত্মিক সকল সম্পদেই সমৃদ্ধ। এ কারণে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে পর্যটকদের আগমন ঘটছে, আকর্ষণ করছে।

চীনের ইতিহাসখ্যাত পর্যটক ফা হিয়েন, আনুমানিক খ্রিস্টীয় ৩৯৯ অব্দে পায়ে হেঁটে বাংলা ভ্রমণে আসেন। তিনি মূলত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তিব্বতের পামীর মালভূমির দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে সঙ্গীদের সাথে এখানে আসেন। তিনি পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, বাংলাদেশসহ শ্রীলঙ্কাও ভ্রমণ করেন। তার লেখা ভ্রমণকাহিনিতে প্রাচীন বাংলার উল্লেখ রয়েছে।

হিউয়েন সাং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, পর্যটক এবং অনুবাদক। ৬৩০-৬৪০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি চীন থেকে বাংলা ভ্রমণে আসেন। চীন ও ভারতের মধ্যকার যোগসূত্র স্থাপনে তার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। মূলত গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও নিদর্শন পরিদর্শন এবং অন্যান্য ভিক্ষুদের রচনাবলী সংগ্রহের জন্য তিনি এই ভ্রমণ শুরু করেছিলেন। তার লেখা ভ্রমণকাহিনি থেকে জানা যায় ওই সময়ে তিনি সমতটের প্রায় ৩৫টি বিহার ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও পরিদর্শন করেন। সেখানে তার সাথে অধ্যাপক শীলভদ্রের সাক্ষাৎ হয়।

সপ্তম শতকে বাংলায় আসেন আরেক চীনা নাগরিক 'ই-সিং'। তিনি হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল ঘুরে দেখেছিলেন। তার বর্ণনামতে তখনকার সময়ে শালি ধানের ভাত বেশ জনপ্রিয় ছিল। মাসকলাই, তিল, মুগ ও যবের চাষ হতো।

নবম শতকে, মতান্তরে ১১৫১ সালে, এখানে এসেছিলেন আরব দেশের পর্যটক সোলায়মান। তার লেখা ভ্রমণ কাহিনির নাম 'সিল সিলাত আল তাওয়ারিখ'। এই বইটি লন্ডন থেকে প্রকাশ হয়। তিনি বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মানুষের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

ইবনে বতুতা ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে আসেন বাংলা ভ্রমণে। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনির নাম 'ট্র্যাভেল অব ইবনে বতুতা'। তিনি যমুনা, পদ্মা, মেঘনা নদীর অপার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়েছেন। তার বর্ণনামতে তখন সুদকাও অঞ্চলটি জলা ও পাহাড়ে পরিপূর্ণ ছিল। সিলেট শহরে শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিজি নামক এক দরবেশের সাথে দেখা হওয়ার কথা তিনি বর্ণনা করেছেন। অনুমান করা হয় যে এই দরবেশই হযরত শাহ জালাল (রহ:)।

আনুমানিক ১৬৫৫ সালে ইতালির নিকোলা মানুচ্চি বাংলায় এসেছিলেন। তিনি মুঘল রাজদরবারে দারাশিকোর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তখন ঢাকার সুবেদার ছিলেন মীর জুমলা। সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে ঢাকা আসতে তার সময় লেগেছিল ৪০ দিন।

এ ছাড়াও প্রাচীন বাংলায় আগত পর্যটকদের মাঝে ভূগোলবিদ টলেমী ও ডাইওনিসাস, পর্তুগালের দুয়ার্তে বারবোসা, ফ্রান্সের জহুরী টার্ভানিয়ার, ইংল্যান্ডের রালফ ফিচ, ইতালির সিজার ফ্রেডারিখের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। তারা এসেছিলেন এই সমৃদ্ধ অপরূপ বাংলায়। আরও বহু বিখ্যাত পর্যটকের বাংলায় ভ্রমণে আসার ইতিহাস আমাদের জানা। সেই ঐতিহ্য কাজে লাগিয়ে পর্যটন খাতকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে পর্যটন কেন্দ্রগুলো বৈচিত্র্যময় হওয়ার কারণে পর্যটকদের মধ্যেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

Photo Credit: Insta Vid

গ্রাম পর্যটনের দিকে ঝুঁকছি না কেন

শহরের সংস্কৃতি জাতীয় ও বৈশ্বিক ভাষায় কথা বলে, তাদের জীবনযাপনকে একটি দূষিত পরিবেশ ও মনোস্বাস্থ্যগত নেতিবাচকতায় ডুবিয়ে রাখে। কিন্তু গ্রামীণ সংস্কৃতির শেকড়ে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী ভাষা, চর্চা, অর্থনীতি, খাদ্য, এবং সবথেকে অনুপ্রেরণাদায়ক ইকো সিস্টেম।

শওকত আলী তারা
প্রাবন্ধিক ও প্রকাশক

দেশীয় পর্যটনে হঠাৎ করেই যেন একটা সাহসী প্রভাব পড়েছে সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পরিবার কাঠামোতে। দেশের বিত্তবান বা ধনাঢ্যদের জন্যই পর্যটন-এ ধারণা এখন ভুল। সকালে বেড়িয়ে সন্ধ্যায় লক্ষী ছেলে-মেয়ের মতো ঘরে ফিরে আসা বনভোজনের ধারণা থেকে হুট করেই এ পরিবর্তন চলে এল যেন। ইন্টারনেট কানেকটিভিটির শক্তিতে এখন জন্মস্থানের সীমানা পেরিয়ে আরও দূরের সীমা অতিক্রম করে ঘুরতে যাওয়া খুব সাধারণ বিষয়। এখানে বয়সের কোনো বাধাও নেই। পর্যটনস্পটে একই পরিবারের তিন-চার প্রজন্মের প্রতিনিধিরা ছবি-ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করছেন। ভেঙে গেছে জনপ্রিয় পর্যটনস্পটের বাণিজ্যিক প্রচারণার স্থানগুলোর মনোপলি বা একচ্ছত্র আধিপত্য। মানুষ নিত্য ছুটছে নতুনত্বের অনুসন্ধানে, সেখানে মানছে না যোগাযোগ ব্যবস্থার সংকট বা দুর্গম্যতার ভয়। সাধারণ নাগরিকদের এই আনন্দিত তৃপ্তি, এই সাধ ও সাধ্যের পরিস্ফূটন দেশীয় অর্থনীতিতে একেবারেই নতুন পরাগায়ন। এ দৃশ্যপট শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক আশাজাগানিয়া বার্তা বহন করে না, যুক্ত করছে একটি সাংস্কৃতিক অভিযাত্রিক মননশীল পট পরিবর্তনের। এই সুযোগ এখন খরস্রোতা নদীর মতো বহমান। এই স্রোতধারায় বাংলাদেশের পর্যটনে বহুমুখীকরণের এক অনন্য পালাবদলের কাল এখন। এই লেখায় তাই আলোকপাত করতে চাইব নতুনধারার 'গ্রাম পর্যটন' নিয়ে।

বর্হিবিশ্ব ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলো গ্রাম পর্যটন নিয়ে কী করছে: ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে শুরু করে পার্শ্ববর্তী ভারত, নেপাল, ভুটান কোনো দেশই আর বসে নেই। সবাই রুরাল বা ভিলেজ ট্যুরিজমে বেশ জোর দিয়েছে। তারা সফলতাও পেয়েছে ব্যাপকভাবে। সহজভাবে বোঝার জন্য আমরা কয়েকটি উদ্যোগের কথা সামনে আনতে পারি। উন্নত দেশগুলো গ্রামীণ পর্যটন ও পরিবেশগত স্বেচ্ছাসেবক ধারণা নিয়ে পর্যটন শুরু করেছে বৈশ্বিক বাস্তবতা থেকেই। পরিবেশগত স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার অর্থ, 'পৃথিবীকে নিজে কিছু ফিরিয়ে দেওয়া।' এতে বাগান করা, গাছ লাগানো, সংরক্ষণ, জৈব নির্মাণ,

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পুনর্ব্যবহার এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত। একজন পরিবেশগত স্বেচ্ছাসেবকের সমগ্র জীবনে এটি একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং তাদের পরিবেশগত চেতনাকে স্থায়ী ও প্রসারিত করে। রাষ্ট্রও অনেক গুরুত্বের সঙ্গে নেয়। সব প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য এটি নিখুঁত ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। অনেক ধরনের প্রকল্প চালু আছে সেখানে। ওয়ার্ল্ডপ্যাকারদের সাথে এখানে নিজেকে স্বেচ্ছাসেবক করা যে কারও জন্য একটি দুর্দান্ত শুরু, কারণ আপনার বাগান করার অভিজ্ঞতা না থাকলেও আপনি প্রকল্পগুলিতে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন এবং আপনি চাকরির মতো করেই শিখবেন। এটি সত্যিই পর্যটকের পছন্দজনক গন্তব্যের গ্রামীণ জায়গাটিকে জানার, স্থানীয়দের মতো জীবনযাপন করার, তাঁর হোস্ট পরিবারের একটি অংশ হওয়ার, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে আরও শিখতে এবং নতুন দক্ষতা শেখার একটি অবিশ্বাস্য সুযোগ দেওয়া হয়। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই জাতীয় উদ্যানগুলোতে কাজ করার অনন্য সুযোগ থাকে। আর এই উদ্যান শহর দূরবর্তী গ্রামীণ কাঠামোতে অবস্থিত। আপনি যদি পশুপ্রেমী হন এবং পশু অভয়ারণ্যে সাহায্য করতে পারেন। সাহায্য করতে পারেন ছোট পশু পালনেও। যারা সামাজিক হতে পছন্দ করে এবং মানুষের সাথে কাজ করতে পছন্দ করে তাদের জন্যও সুযোগ রয়েছে। সারা বিশ্বেই স্বেচ্ছাসেবী করার জন্য গ্রামীণ পর্যটনের প্রচুর প্রকল্প রয়েছে। প্রশ্ন জাগে, আমরা বাংলাদেশে এখনো এই ধারণা বাস্তবায়নে কাজ শুরু করছি না কেন?

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে গ্রামীণ ভ্রমণ একটি খাঁটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দেবে। ওয়ার্ল্ডপ্যাকারদের সাথে এখানে একজন স্বেচ্ছাসেবী পর্যটক সত্যিই স্থানীয় জীবন দেখতে-বুঝতে পারেন। ভারতে গ্রামীণ এলাকায় বসবাস-কারী ভারতীয়দের জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ, স্থানীয় সম্প্রদায়কে সাহায্য করার জন্য আপনার কিছু সময় উৎসর্গ করার প্রচেষ্টা রাষ্ট্র ও উদ্যোক্তা উভয় দিক থেকেই আমন্ত্রণ রয়েছে। চা বাগান এবং পাহাড়ের সুবিধাবঞ্চিত লোকদের জন্য একটি দাতব্য বাড়িতে আপনার সময় কাটানোর ব্যবস্থা থাকে। অনেক ধরণের এনজিও গড়ে উঠেছে। স্বেচ্ছাসেবকের কাজের মধ্যে রয়েছে বাগান করা, পানি দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, গৃহস্থালি বা নার্সিং। এসবের মধ্যে দিয়ে এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি করার জন্য আপনি সুযোগ পাবেন।

তবে স্বেচ্ছাসেবী পর্যটন ছাড়াও ভারতে বাণিজ্যিকভাবে গ্রাম ও সম্প্রদায়ভিত্তিক পর্যটনে অনেটাই প্রতিষ্ঠিত। তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে নানা নিত্যনতুন আইডিয়া এখানে যুক্ত করছেন। জনপ্রতিনিধিরা নিজ থেকেই কর্মসংস্থান ও গ্রামের মানুষের আয় বৃদ্ধির জন্য হিলিং ট্যুরিজম, খামার ও ফরেস্ট ট্যুরিজম, ট্রিটমেন্ট ট্যুরিজমের মতো নাম দিয়ে প্যাকেজ তৈরি করছেন। সারা বিশ্ব থেকেই পর্যটকরা সেসব গ্রামে রিফ্রেশমেন্টের জন্য যাচ্ছেন। ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অরগানাইজেশন ইতিমধ্যেই ভারতের ৩টি গ্রামকে পুরস্কারের জন্য সেরা পর্যটন গ্রাম ক্যাটাগরিতে মনোনীত করেছে। পর্যটকদের কাছে এরকম জনপ্রিয়তায় তুঙ্গে থাকা ভারতের ২০টিরও অধিক গ্রাম রয়েছে। এসব সফলতা দেখে বিভিন্ন রাজ্য সরকার নিজ নিজ এলাকায় প্রতিযোগিতায় লেগে পড়েছেন। নেপাল ভুটানও এখানে পিছিয়ে নেই।

আমাদের মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিই: আমাদের অভ্যন্তরীণ পর্যটন শক্তি যতটুকু আছে তা যথেষ্ট বহির্বিশ্বের সঙ্গে কদম মেলানোর জন্য। তবে বলতে হবে আমরা নিজেদের শক্তিটুকু সম্পর্কে সেভাবে জানি না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের অন্য দেশগুলোর চেয়েও হয়তো সেগুলো অনন্য। এই অজ্ঞানতা আর অবহেলাকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শিষের ওপরে একটি শিশির বিন্দু।'

বাংলাদেশের মানুষের রক্তের মধ্যে ভ্রমণের জিনগত একটা শক্তি আছে। আমরা এভাবে বিষয়টাকে কখনো খুঁজি না। কোনো পরিকল্পনায় ভিত্তিমূলে আনি না। হয়তোবা এভাবে ভাববার লোকজনই নেই। সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচ্ছিন্নতা রয়েছে সকল পরিকল্পনায়। বাংলা ভাষার আদি শব্দগুলোর মধ্যে 'নাইয়র' শব্দটি আছে। এই নাইয়র অনেকটা নারীকেন্দ্রিক প্রচার পেলেও এটা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সমতার বার্তা দেয়। আমাদের সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতির প্রতিটি অঙ্গনেই আমাদের জিনগত ভ্রমণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যদি বলি, কবি জসীম উদ্‌দীনের 'মামার বাড়ি' কবিতা, সেখানে 'পাকা জামের মধুর রসে রঙিন করি মুখ' আমাদের নিজস্ব ফল সমৃদ্ধ জ্যৈষ্ঠ মাসে শিশুদের মামা বাড়ি ভ্রমণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

গ্রামীণ সমাজকাঠামোর রেওয়াজ অনুযায়ী নানাবাড়ি, দাদাবাড়ি ফল খেতে যাওয়া, শীত মৌসুমে পিঠা-পুলি খেতে যাওয়া প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি। তাঁর 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটিও একইভাবে বাংলার আবহমানতার রূপ দেখতে ডাকে – 'তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়'। রবীন্দ্রনাথের 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ' গান শুনতে যেমন ভালো লাগে, তেমনি গ্রামের প্রতি জাগতিক প্রেমও জাগায়। ভরা বর্ষায় শচিন দেব বর্মণের 'তোরা কে যাস রে ভাটির গাঙ বাইয়া/ আমারে ভাইধন রে কইয়ো, নাইওর নিতো বইলা' গানটি একজন নববধুর বাপের বাড়ি যাওয়ার আকুলতা ভেসে উঠলেও এখানে নদীপ্রধান দেশে কন্যাদের বাপের বাড়ি ভ্রমণের সময়কালকে নির্দেশ করা হয়েছে। আমাদের লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, সংস্কৃতি, লোকাচার সবখানেই ভ্রমণের যোগসূত্র রয়েছে।

কিন্তু এই জায়গাটিতে আধুনিকতার মেলবন্ধন গড়ে ওঠেনি। কেন ওঠেনি তার জন্য আফসোস, হাপিত্যেশ করে লাভ নেই। আজ, এখন থেকেই সেটা শুরু করতে হবে।

গ্রামে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে না এমন মানুষ খুব কমই আছে। শুধু খুঁজে বের করতে হবে আমার গ্রামের মূল শক্তিটা কোথায় আর দুর্বলতাটাই বা কোথায়। একজন অনাত্মীয় মানুষ অতিথি হয়ে এলে তাকে কীভাবে অপ্যায়ন করবেন, তাকে গ্রামের বিশেষত্ব কী করে বোঝাবেন এবং নিরাপত্তা কী করে দেবেন। তার মুগ্ধতা জাগানোর অনেক উপকরণ গ্রামের চারপাশেই ছড়িয়ে আছে। হতে পারে আপনার আঞ্চলিক ঐতিহ্যের খাবার রান্না করে খাওয়ানো, ফসলের মাঠ গড়ে তোলার বাস্তব অভিজ্ঞতা, স্থানীয় লোকসংগীত শোনানো – এমন আরও কত কিছুই তো আছে, যা দিয়ে বিদেশিরা পর্যটক আকর্ষণ করছে। আমাদের চাই শুধু উপস্থাপনের বাঙালিয়ানা ও সৃজনশীলতা।

যারা বাংলায় কথা বলে না তাদের কাছে যাই: ২০২২ জনশুমরিতে ৫০টি ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলা বাদ দিয়ে আরও যে ৪০টি ভাষা আমাদের রয়েছে, তার মধ্যে ৩৪টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে পাওয়া যায়। একবার ভাবুন, আমাদের এই ছোট দেশটি কত বর্ণিল, কত বৈচিত্র্যময় জাতিসত্ত্বা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী বিশাল সম্পদ এটা! এখন প্রশ্ন হল, আমরা নিজ দেশের মানুষ হয়ে যারা বাংলায় কথা বলি, বাংলায় পড়ালেখা করি তাদের সঙ্গে এই বহুভাষার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ কতটুক?

মাতৃক্রোড়ে পৃথিবীর সব ভাষাই মধুর। সব ভাষার বর্ণমালা নেই। হয়তোবা সেটা থাকাও অনেক জটিল ও কঠিন। এই বহুমুখী ভাষার বৈচিত্র্য নগর সভ্যতায় ঠাঁই করে নিতে পারে না। এগুলো গ্রামেই বেঁচে থাকে পরিবার, গোত্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে। আর এখানেই সম্প্রদায়গত যোগাযোগ বন্ধনের মূল প্রাণভোমরা জেগে আছে। আমরা ইচ্ছা করলেই বাংলা ভাষাভাষীরা দোভাষী নিয়ে তাদের ভাষার সঙ্গে মিলতে পারি। এটা যে একটি ভাষার প্রতি আরেকটা ভাষার কত বড় সম্মান প্রদর্শন, তা ওই ভাষার মানুষরাই অনুভব করতে পারবে। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, অথচ নিজ দেশেই আমরা ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠির ভাষা রক্ষায় ভূমিকা রাখছি না। আমাদের মনে রাখতে হবে, ভাষাকে জাদুঘরে বা দু'চারটা প্রকাশনা দিয়ে টিকিয়ে রাখা যায় না। ভাষা বেঁচে থাকে ব্যবহারে, চর্চায়, সম্মানে। গ্রাম পর্যটন ও গোষ্ঠীগত পর্যটন এখানে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম।

গোষ্ঠীগত পর্যটন সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে সবচেয়ে আনন্দময় দিক হলো, উভয় পক্ষের জন্য সাংস্কৃতিক বিনিময়ে সক্ষম করে তোলা। এটি একটি দুর্দান্ত ধারণা, কারণ এটি কেবল তাদের সারা বিশ্বের লোকেদের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তাদের দিগন্তকে প্রসারিত করে না, স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান তৈরি করে এবং সমাজকে নতুন দক্ষতা এবং ভাষা শিখতে অনুপ্রাণিত করে। এই পরিস্থিতিতে, পর্যটকদের থেকে আহরিত অর্থ প্রান্তিক পরিবারগুলোর মধ্যে থাকে এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য চলমান প্রকল্পগুলির সফলতায় গতি সঞ্চার করে। যা সমগ্র গোষ্ঠীকে উপকৃত করে।

গ্রামেই পর্যটনের আলাদীনের চেরাগ লুকিয়ে আছে: শহরের সংস্কৃতি জাতীয় ও বৈশ্বিক ভাষায় কথা বলে, তাদের জীবনযাপনকে একটি দূষিত পরিবেশ ও মনোস্বাস্থ্যগত নেতিবাচকতায় ডুবিয়ে রাখে। কিন্তু গ্রামীণ সংস্কৃতির শিকড়ে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী ভাষা, চর্চা, অর্থনীতি, খাদ্য, এবং সবথেকে অনুপ্রেরণাদায়ক ইকো সিস্টেম। গ্রামে মানুষ নিবিড় পরিবেশগত কারণে এক ধরনের মুক্তি খুঁজে পায়। ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অরগানাইজেশন (ইউএনডব্লিউটিও) গ্রামীণ পর্যটনকে এক ধরনের পর্যটন কার্যকলাপ হিসাবে বোঝে যেখানে দর্শনার্থীদের অভিজ্ঞতা সাধারণত প্রকৃতিভিত্তিক কার্যকলাপ, কৃষি, গ্রামীণ জীবনধারা বা সংস্কৃতি এবং দর্শনীয় স্থানগুলির সাথে যুক্ত ও বিস্তৃত পণ্যের সাথে সম্পর্কিত।

পর্যটনকে রূপান্তর, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য একটি ইতিবাচক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, ইউএনডব্লিউটিওর উদ্যোগে 'বেস্ট ট্যুরিজম ভিলেজ' ঘোষণা করেছে। এটি গ্রামীণ সামাজকাঠামোর গ্রামগুলির মূল্যায়ন এবং সুরক্ষায় তাদের সংশ্লিষ্ট ল্যান্ডস্কেপ, স্থানিক জ্ঞানব্যবস্থা, জৈবিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য স্থানীয় মূল্যবোধ এবং ক্রিয়াকলাপসহ তাদের সুভোজনবিদ্যা নিয়ে পর্যটনের ভূমিকাকে এগিয়ে নিতে চায়। পর্যটন এবং গ্রামীণ উন্নয়নের ওপর ইউএনডব্লিউটিও একটি অসাধারণ সুপারিশপত্রও দিয়েছে। এই সমর্থন ও সুবর্ণ সুযোগকে বাংলাদেশে কীভাবে কাজে লাগাবে সেটাই এখন মুখ্য বিষয়।

তবে আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। শ্রীমঙ্গলের 'রাধানগর' গ্রামটি জ্বলজ্বলে প্রমাণ। পর্যটনের সুবাদে এখন অজপাড়াগাঁটি সারা দেশে পরিচিত। কেন মানুষ এখানে নিবিড় পরিবেশে সময় কাটাতে চায়। একবার ভাবুন, চারপাশে ছোট ছোট পাহাড়ি টিলা। সবুজ পাহাড় থেকে চুঁইয়ে আসা ঝিরিতে পানি বয়ে চলে ঝিরিঝিরি। প্রকৃতির এই মনোরম স্নিগ্ধ রূপ, পাহাড়ি পরিবেশে মানুষের সরল জীবনযাত্রা, কৃষি কর্মযজ্ঞ, তাদের লোকজ বাড়িঘর। সবই আপনাকে কাছে টেনে নেবে। এ গ্রামেই গড়ে উঠেছে পাঁচতারকা মানের হোটেল গ্র্যান্ড সুলতান। গ্রামে ঘুরতে ঘুরতেই চোখে পড়বে একাধিক রিসোর্ট, হোটেল, ইকো-কটেজ। মোট ২৫টি হোটেল-রিসোর্ট রয়েছে এই

গ্রামে। শ্রীমঙ্গল ঘুরতে আসা পর্যটকদের একটা বড় অংশ থাকার জন্য রাধানগরকেই বেছে নেয়। একবার চিন্তা করুন, এই গ্রামের বর্তমান অর্থনীতি কত বড়। সরকারকে তারা উল্টো কত ভ্যাট-ট্যাক্স দেয়। আর স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য এই নব-বাস্তবতা আলাদীনের চেরাগ বললে অত্যুক্তি হবে না। অথচ গ্রামবাসী তাদের চিরচেনা গ্রামকে আদি রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। হয়তো গ্রাম পর্যটনের ম্যাজিকটা এখানেই।

আমাদের দুটো সেরা উদাহরণ – অসম্ভব বলে কিছু নেই: দুজন উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় 'গ্রাম পর্যটন' ও 'গোষ্ঠিগত পর্যটন' বাংলাদেশে কতটা সফল হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনেই। একজন নিরঞ্জন সিংহ- প্রথম গোষ্ঠিগত পর্যটনের সূচনা করেছেন। যে গ্রামের সবাই এখন পর্যটকবান্ধব। সবাই নিজ বাড়িতে থেকেই অর্থ উপার্জন করছেন। অপরজন জাফর তুহিন, যিনি গ্রাম পর্যটনের প্রথম উদ্যোক্তা।

নিরঞ্জন সিংহের জন্মগ্রাম মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের ভানুবিল মাঝেরগাঁওয়ের ৭৫টি বাড়ি নিয়ে গড়ে তুলেছেন মণিপুরি 'গোষ্ঠিগত পর্যটন'। তাঁর বাড়ি থেকেই শুরু হয় বাংলাদেশের 'গোষ্ঠিগত পর্যটন'। নিরঞ্জন সিংহ মণি-পুরিদের জীবনযাপন, তাঁতবস্ত্র বোনাসহ এলাকার পর্যটনস্থানগুলো পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখান। এখন তার গ্রামে প্রতিটি ঘরের একটা অংশ পর্যটকদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো বাড়ির দুটি, কোনো বাড়িতে চারটি কক্ষেই পর্যটকদের পরিবারের সদস্য হয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি বাড়িতে তাঁত আছে। সেখানে স্বল্প খরচে গ্রামের অনন্য আতিথিয়তায় পর্যটকরা মুগ্ধ হচ্ছেন।

অন্যদিকে একার চেষ্টা ও বিশ্বাসে জাফর তুহিন গড়ে তুলেছেন গ্রাম পর্যটনের এক নতুন ভুবন। এখন তিনিই যেন এক টুকরা বাংলাদেশের হৃদয়। হাজারো বিদেশি পর্যটক বাংলাদেশে নিয়ে এসেছেন জাফর তুহিন। তাদের ঘুরে দেখিয়েছেন বাংলার গ্রাম, জনপদ ও দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান। এসব পর্যটকের অনেকেই তাদের দেশে গিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্লগে লিখেছেন, তৈরি করেছেন ইউটিউবে প্রামাণ্যচিত্র। বিদেশি পত্রিকায় বাংলাদেশের গ্রাম নিয়ে ছাপা হয়েছে ফিচার। সেই সুবাদে বাংলাদেশের অনেক গ্রাম বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে।

গ্রাম পর্যটন না থাকায় প্রতিদিন কত টাকা ক্ষতি হচ্ছে: যদি আমরা গ্রাম পর্যটনে আয়ের সুযোগ হিসেব না করে প্রতিদিন ক্ষতির পরিমাণটা হিসাব করি তাহলে সে অঙ্কটা কত হবে? একটি উর্বর জমি ফসল ফলাতে না পরলে কী হয়? অর্থাৎ হাতের কাছে ভরা কলস, কিন্তু পানি খেতে পারছি না! সবচেয়ে বড় বিষয় পুরো গ্রামটা একটি নতুন অর্থনৈতিক পরিবর্তনে প্রবেশ করে। যে কাজটি করে আনন্দ, তৃপ্তি এবং একইসঙ্গে লাভবান হওয়া যায় – সেটা নিজ গ্রামে বাস করেই।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৮৭ হাজারের অধিক গ্রাম রয়েছে। এর মধ্যে যদি প্রাথমিকভাবে এক হাজার গ্রামকে, এবং ৪০টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ২০টি সম্প্রদায়কে বেছে নিই, তাহলে বিষয়টা কেমন দাঁড়ায়! একজন জাফর তুহিন সবকিছু বাদ দিয়ে স্বাচ্ছন্দে মাসে এক লাখ টাকার অধিক গ্রামে থেকেই আয় করেন। আর যদি নিরঞ্জন সিংহের মণিপুরি গোষ্ঠিগত পর্যটনের ৭৫টি বাড়ির আয়ের হিসাব করি!

আমরা অফিসিয়ালি বাংলাদেশের পর্যটন ক্ষেত্রকে পরিচিত করে তুলেছি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, জীববৈচিত্র্য, সুন্দরবন, কক্সবাজার, চারু ও কারুশিল্প ও পার্বত্য অঞ্চলকে। কিন্তু আমাদের গ্রামকে এই তালিকায় কাছে টানিনি। এটা যে কত বড় ভুল তা বুঝতেই পারিনি স্বাধীনতার ৫২ বছর পেরিয়ে গেলেও। কে কাকে বোঝাবে- সোনার খনি, হীরের খনি শুধু মাটির গহীনেই থাকে না, মাটির ওপরেও থাকে!

পর্যটনশিল্প বিকাশে গুরুত্ব দিন

দেশের মানুষও দেশকে দেখতে চায়, বেড়াতে চায়, অবসর সময় বিভিন্ন জেলায় জেলায় বেড়ানো বেশ অভ্যাস গড়ে উঠেছে। এই জন্য বিভিন্ন জেলায় বিনোদন ও থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা থাকলে পর্যটনশিল্প প্রসার লাভ করবে।

মোঃ আতিকুর রহমান
কলামিস্ট ও সাবেক জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিইইউএফটি

পর্যটন একটি সম্ভাবনাময় বড় খাত। দীর্ঘদিন ধরে এই খাতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ তেমন হয়নি। হলেও খুব একটা দৃশ্যমান হয়নি। সরকার বড় বড় যে প্রকল্পগুলো হাতে নিয়েছে, তা চলমান। যদিও করোনা কালে এই সেক্টরে সার্বিক অগ্রগতি দারুণভাবে বাধাগ্রস্থ হয়েছে। বর্তমানে বিদেশি বিনিয়োগ নেই বললেই চলে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের উচিত এই সেক্টরের সার্বিক অগ্রগতিকে গুরুত্ব দেওয়া।

পদ্মা সেতু চালু হওয়ার মধ্যদিয়ে দেশে পর্যটনের সম্ভাবনা বেড়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এখনও পর্যটনস্থানগুলোতে পর্যটকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা তেমন বাড়েনি। যা এই খাতের সার্বিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে, এটি হতাশাজনক। মূলত দেশের অধিকাংশ পর্যটনস্থানের যোগাযোগব্যবস্থা, নিরাপত্তা, মানসম্মত আবাসিক হোটেল ও স্বাস্থ্যসম্মত রেস্তোরাঁর এখন বেশ অভাব রয়েছে। অনেক স্থানে যোগাযোগের অভ্যন্তরীণ সড়কগুলো এখন অধিকাংশ কাঁচা রয়ে গেছে। যা পর্যটকদের যাতায়াতে ভোগান্তিতে ফেলছে। তাই যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি মনে করি।

যদি দেশে আকর্ষণীয় সমুদ্রসৈকত কুয়াকাটার সার্বিক পরিস্থিতির কথাই বলি, তা হলে বলতে হয়, এই আকর্ষণীয় সমুদ্রসৈকত দক্ষিণাঞ্চলে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় অবস্থিত। সমুদ্রসৈকতটি লম্বায় ১৮ কিলোমিটার ও প্রস্থ আধা কিলোমিটার। এ সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

আগের তুলনায় কুয়াকাটায় পর্যটকের উপস্থিতি বাড়ছে। কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল মালিকগণ বলছেন, পদ্মা সেতু চালু হওয়ার আগে বছরে কুয়াকাটায় ১২-১৫ লাখ পর্যটকের আগমন ঘটত। কিন্তু গত ২৫ জুলাই ২০২২ সালে পদ্মাসেতু চালু হওয়ার পর ১ মাসে প্রায় দেড় লাখ পর্যটক কুয়াকাটায় এসেছেন। যদিও এই সময়ে কুয়াকাটায় পর্যটক তেমন একটা থাকেন না। সেদিক থেকে পর্যালোচনা করলে ১ মাসের চিত্র খুবই সন্তোষজনক। কুয়াকাটার সঙ্গে ঢাকার

সরাসরি সড়কযোগাযোগ তৈরি হয়েছে। এখন বছরে কুয়াকাটায় ২২-২৫ লাখ পর্যটক ভ্রমণ করবেন বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন। দুঃখজনকভাবে বলতে হয় এখন কুয়াকাটা পৌরসভার অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোও কাঁচা রয়ে গেছে, যা পর্যটকদের দারুণ ভোগান্তি ও ভ্রমণের ইচ্ছাকে মলিন করছে। সম্প্রতি ঢাকা থেকে কুয়াকাটায় বেড়াতে আসা অনেকের অভিযোগ দীর্ঘ সড়কপথ পাড়ি দিয়ে যখন কুয়াকাটায় পা দিই, তখন হতাশ হতে হয়। কুয়াকাটার প্রধান সমস্যা হচ্ছে সৈকতের চরম দুরবস্থা। সৈকতটি সাগরের ঢেউয়ে ভেঙে ক্রমে ছোট হয়ে গেছে। নোংরা-আবর্জনায় যত্রতত্র সৈকতের পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এই অবস্থার অবসান হওয়া জরুরি।

তথ্যমতে, ২০১০ সালে কুয়াকাটা পৌরসভায় উন্নীত হয়। এটি তৃতীয় শ্রেণীর পৌরসভা। সম্ভাবনাময় পর্যটনকেন্দ্র হলেও এখানকার অধিকাংশ সড়ক কাঁচা পড়ে রয়েছে যা দ্রুত মেরামত করা জরুরি বলে মনে করি। যদিও সংশ্লিষ্টরা বলেন, সাগর-প্রকৃতি, জেলেদের জীবন ব্যবস্থাপনাসহ কুয়াকাটার সবকিছুই পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয়। অথচ কুয়াকাটার অভ্যন্তরীণ সড়ক ব্যবস্থাপনা সেভাবে গড়ে না ওঠায় পর্যটনকে বাধাগ্রস্ত করছে। পর্যটকেরা ঘুরে বেড়াবেন, ছোটাছুটি করবেন, সে পরিবেশ অপর্যাপ্ত। যার কারণে সবাই হতাশ হন। এই অবস্থার আশু সমাধান জরুরি।

দেশের পর্যটন খাতকে সমৃদ্ধ করতে হলে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টসহ অবকাঠামো উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এখন অনেক রেস্তোরাঁয় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নেই। প্রায় সময় এসব রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। বর্তমানে কুয়াকাটায় পর্যটকদের থাকার জন্য ১৫০টির বেশি হোটেল-মোটেল রয়েছে। এর মধ্যে তিনতারকা হোটেল আছে মাত্র দুটি। বাকি হোটেলগুলোর কক্ষ ব্যবস্থাপনা, হোটেলের পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কুয়াকাটা অ্যাসোসিয়েশনভুক্ত হোটেল-মোটেল আছে ৭৪টি। এর বাইরে আছে ৫৬টি হোটেল-মোটেল। প্রথম শ্রেণির হোটেল রয়েছে ১০-১৫টির মতো। এসব হোটেল বহু আগে গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এইসব হোটেল-মোটেলে আধুনিক কোন সুযোগ-সুবিধাসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, যা পর্যটকদের এই স্থানে ভ্রমণের বিষয়কে নিরুৎসাহিত করছে।

যদিও বর্তমানে সময়ের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনাও বাড়ছে। এখন যারা হোটেল-মোটেল তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছেন, তারা হোটেল ব্যবস্থাপনায় বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলছেন, যা ইতিবাচক। পাশাপাশি পুরোনো হোটেলগুলোর মালিকরাও কেউ কেউ হোটেলের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় পরিবর্তন আনার চিন্তা করছেন। এখন যদি রাস্তাঘাটের মনোন্নয়নসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় তবে আগামীতে পর্যটনশিল্পে এর সুফল পাওয়া যাবে।

যদিও সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কুয়াকাটায় পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে। পৌরসভার অভ্যন্তরীণ সড়ক উন্নয়ন, হোটেল-মোটেলের সেবার মান বাড়ানো ও সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা উন্নতির জন্য কিছু পরিকল্পনা তারা হাতে নিয়েছেন, যা ইতিবাচক বলে মনে করি।

যদিও বাস্তবতা হলো বিদেশি বড় বিনিয়োগ ছাড়া পর্যটন খাতকে কোনোক্রমেই বিদেশিদের মাঝে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব হবে না। সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে শুধু বিদেশি আকর্ষণীয় বিশাল বিনিয়োগের মাধ্যমে জমজমাট ব্যবসা চলেছে। আমাদেরও অনুরূপ চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

ইতিমধ্যে কক্সবাজার বাংলাদেশের পর্যটনের রাজধানী হিসেবে বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। এখানে বিশেষ করে ছুটির দিনে এত বেশি পর্যটকের আগমন ঘটে যে, হোটেল-মোটেলগুলোতে ঠাঁই হয় না। এ কারণে এখানে অবকাঠামোগত ব্যবস্থার আরও উন্নয়নের সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। দেশি-বিদেশি পর্যটক আকর্ষণের জন্য কক্সবাজার ও এর আশপাশের এলাকাকে আরও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার পাশাপাশি সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটাও জরুরি।

যদিও বর্তমান সরকার পর্যটনশিল্পের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে, যা ইতিবাচক বলে মনে করি। তথ্য মতে, বর্তমানে কক্সবাজারে পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণে ২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগুলোতে প্রায় প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগ হবে ৩৭ হাজার কোটি টাকা। পরোক্ষভাবে বিনিয়োগ হবে ১ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা। প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে: কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন, আধুনিক হোটেল-মোটল নির্মাণ, মহেশখালীতে বিদ্যুৎকেন্দ্র, সোনাদিয়াকে বিশেষ পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা, ইনানি সৈকতের উন্নয়ন, টেকনাফের সাবরাং ইকো ট্যুরিজম পার্ক নির্মাণ, শ্যামলাপুর সৈকতের উন্নয়ন, ঝিলংঝা সৈকতের উন্নয়ন, চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণ, কুতুবদিয়ায় বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্প্রসারণ, চকোরিয়ায় মিনি সুন্দরবনে পর্যটকদের গমনাগমনের জন্য যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, ডুলাহাজারা সাফারি পার্কের আধুনিকায়ন। এ ছাড়া আরও চারটি নতুন প্রকল্প নিতে যাচ্ছে সরকার। এসব বাস্তবায়িত হলে আগামীতে দেশের পর্যটন খাত আরও চাঙ্গা হবে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ও পিপিপির মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কক্সবাজারে যাতায়াত করার জন্য রেললাইন

নির্মাণ করা হচ্ছে, যা ইতিবাচক বলে মনে করি। এই শিল্পের সার্বিক অগ্রগতি আনয়নে সংশ্লিষ্টদের নিম্নোলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রথমত দেশে পর্যটনশিল্পকে বড় শিল্পখাত হিসেবে দাঁড় করাতে হলে দীর্ঘমেয়াদী ও বিদেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন। উন্নতমানের আকর্ষণীয় ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারলে আমাদের দেশে প্রচুর বিদেশি পর্যটক আসবে। পর্যটকরা কেন সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়েশিয়া যাচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সবচেয়ে বড় নিয়ামক।

দ্বিতীয়ত আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র। বিনোদনের সুন্দর ও নতুন নতুন আইটেম। অনুরূপ আকর্ষণীয় বিনোদনমূলক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারলে পর্যটক আসবে।

তৃতীয়ত পর্যটনের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। পর্যাপ্ত রাস্তা, হোটেল-মোটেল ও বিমানবন্দর সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। যানজটের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

চতুর্থত সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার মানোন্নয়ন সার্বধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

পঞ্চমত সরকারকে পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং সেগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হবে।

দেখা যায়, কয়েক মাসের মধ্যে তৈরি রাস্তা, ব্রিজ, বিল্ডিং ভেঙ্গে যায় বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, যা কাম্য নয়। এজন্য সৎ, নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীর প্রয়োজন।

পরিশেষে বলতে চাই পর্যটনশিল্প বাংলাদেশে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। দেশের মানুষও দেশকে দেখতে চায়, বেড়াতে চায়। অবসর সময়ে বিভিন্ন জেলায় বেড়ানোর অভ্যাস গড়ে উঠেছে মানুষের মধ্যে। এ জন্য বিভিন্ন জেলায় বিনোদন ও থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা থাকলে পর্যটনশিল্প প্রসার লাভ করবে। আর বিদেশিদের জন্য দরকার নিরাপদ সড়ক, সুন্দর থাকা-খাওয়ার হোটেল-মোটেল এবং পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তাব্যবস্থা। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্তাদের দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এমনটিই আমাদের প্রত্যাশা।

BANGLADESH PARJATAN CORPORATION

NATIONAL HOTEL & TOURISM TRAINING INSTITUTE
(NHTTI)

83-88, Bir Uttam A K Khandokar Road, Mohakhali C/A, Dhaka-1213.
Tel : 880-2-222299289, +880-2-222299291
E-mail # nhttibpc2017@gmail.com
Web # www.nhtti.gov.bd

LONG COURSES

Course Name	Course Duration	Entry Requirement
Diploma in Hotel Management	2 Years	H.S.C or equivalent
Professional Chef Course	1 Year	S.S.C or equivalent
Diploma in Culinary Arts & Catering Management	1 Year	S.S.C or equivalent
Diploma in Tourism & Hospitality Management	1 Year	S.S.C or equivalent
Professional Baking Course	1 Year	S.S.C or equivalent

SHORT COURSES

Course Name	Course Duration	Entry Requirement
Food and Beverage Production	18 Weeks	S.S.C or equivalent
Food and Beverage Service	18 Weeks	S.S.C or equivalent
Front Office & Secretarial Operations	18 Weeks	S.S.C or equivalent
Bakery & Pastry Production	18 Weeks	S.S.C or equivalent
Housekeeping & Laundry Operations	18 Weeks	S.S.C or equivalent
Tour Guide Travel Agency Operations	18 Weeks	S.S.C or equivalent
Computer Literacy	18 Weeks	S.S.C or equivalent

THE LARGEST, OLDEST AND BEST HOTEL MANAGEMENT INSTITUTE IN BANGLADESH

LET US SCHEDULE YOUR SPECIAL EVENT

SHOILOPROPAT AUDITORIUM

Parjatan Bhaban, West Agargaon Administrative Area, Dhaka,

`Shoilopropat'- a 5 star auditorium located inside Parjatan Bhaban at Agargaon Dhaka. Without catering and only hall room charge is 80,000 Tk for whole day and 50,000 Tk for half day. Please call for booking at 02-41024218.

BANGLADESH PARJATAN CORPORATION

সেরা মাইক্রোবাস ও ট্যুরিস্ট কোস্টারগুলো **সব এখানে!**

গাড়ির বিবরণ	২৪ ঘণ্টা	১২ ঘণ্টা
১. টুরিস্ট কোস্টার (চালকসহ ৩০ সিট)	১৩,০০০/-	৮,০০০/-
২. মাইক্রো বাস (চালকসহ ১২ সিট)	৪,০০০/-	৩,২০০/-

- ভ্রমণের জন্য জ্বালানীসহ অন্যান্য সকল খরচ গ্রাহককে নিজ দায়িত্বে বহন করতে হবে।
- গাড়ি গ্যারেজ আউট থেকে গ্যারেজ ইন এর মধ্যবর্তী সময়কে হিসাব করা হয়।

বাংলাদেশের আকর্ষণীয় বিভিন্ন স্থানে প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা রয়েছে।

TOURS AND RENT A CAR
BANGLADESH PARJATAN CORPORATION

PACKAGE TOUR PLAN

Tours and rent a car unit of BPC organises tour to all destinations of Bangladesh with its fleet of tourist coaches and other vehicles. High speed wifi and IP camera has been installed inside the Tourist coaches along with frontal camera for the comfort and safety of the tourists. Experienced guides are provided with the tour. All tours are customised according to the demand. Some of our regular tour packages are-

Dhaka-Kuakata-Dhaka
Dhaka-Tungippara-Dhaka
Dhaka-Mongla-Sundarban-Dhaka
Dhaka-Padma Bridge-Vanga-Dhaka
Dhaka-Chittagong-Rangamati-Chittagong-Dhaka
Dhaka-Srimangal-Sylhet-Jaflong-Dhaka
Dhaka-Chittagong-Bandarban-Dhaka
Dhaka-Rajshahi-Chapai-Dhaka
Dhaka-Sonargaon-Dhaka
and more.

Package tour bookings can be confirmed by reaching BPC at 01941666444, 01300439617 and 02-41024218.

BANGLADESH PARJATAN CORPORATION

BANGLADESH PARJATAN CORPORATION

www.hotels.gov.bd

The Largest Hotel Chain of Bangladesh!

Hotel-Motel | Restaurant | Bar & Drink | Training

FOR ADVANCE RESERVATION PLEASE CALL: 88 02 41024218

আপনার আস্থাই আমাদের শক্তি

IFIC

সেবায় • সাফল্যে • আস্থায়

১ আইএফআইসি **৩২.৭৫% সরকারি মালিকানাধীন** একটি সার্বজনীন ব্যাংক।

২ শাখা-উপশাখার সংখ্যা (**১২৪৩+**) বিবেচনায় **দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি** এখন প্রতিবেশী হয়ে ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে।

৩ একমাত্র আমরাই সর্বপ্রথম সব শাখা-উপশাখায় চালু করেছি **ওয়ান স্টপ সার্ভিস**, একই কাউন্টারে সব ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে নিজস্ব দক্ষ কর্মীবাহিনী।

৪ **শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও** আইএফআইসি আমার কার্ড **ক্রেডিট কার্ডের উত্তম বিকল্প** হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এই কার্ড দিয়ে দেশের **১৩,০০০-এরও বেশি এটিএম** থেকে টাকা তোলা যায় **একদম ফ্রি**।

৫ বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার একাউন্ট **'আইএফআইসি আমার একাউন্ট'**-এ আছে একসাথে সেভিংস ও কারেন্ট একাউন্টের লেনদেন সুবিধা, আছে দৈনিক জমার উপরে এফডিআরের মতো আকর্ষণীয় মুনাফা।

৬ শহর-গ্রাম সারা দেশে **পাকা** ও **সেমি-পাকা বাড়ি** এবং **অ্যাপার্টমেন্ট** নির্মাণ/ক্রয়ে বেসরকারি খাতে **অন্যতম শীর্ষ হোম লোন বিতরণকারী ব্যাংক** আইএফআইসি **৩০,০০০ গ্রাহকের মাঝে দিয়েছে ১৩,০০০ কোটি টাকা ঋণ**।

৭ **কৃষি** এবং **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ** সুবিধার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দিন বদলের জন্য আছে **আইএফআইসি আমার সুবর্ণগ্রাম** ও **আইএফআইসি সহজ ঋণ**।

৮ দেশ জুড়ে বিস্তৃত সর্বোচ্চ সংখ্যক শাখা-উপশাখার মাধ্যমে **দেশের যেকোনো প্রান্তে রেমিট্যান্স** গ্রহণ করা এখন আরো সহজ ও নিরাপদ।

৯ বর্তমানে প্রায় **৯,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান** নিশ্চিত করছে আইএফআইসি। এমনকি **করোনাকালেও ৩,৭৭৮ জন নিজস্ব কর্মী নিয়োগ** দেওয়া হয়েছে।

১০ **জাতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি ভ্যাট প্রদানকারী** হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যাংক আইএফআইসি।

১১ যুক্তরাজ্যে নিজস্ব মালিকানাধীন IFIC Money Transfer (UK) Ltd. এবং ওমানে Oman Exchange LLC (৪৯% মালিকানা) সুনামের সাথে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে **২ যুগেরও বেশি সময় ধরে**।

সুদক্ষ কর্মীবাহিনী, উন্নত প্রযুক্তি, সবার জন্য সবরকম ডেলিভারি চ্যানেল, সময়োপযোগী পণ্য ও সেবা নিয়ে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় **প্রতিবেশী** হয়ে ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করছে আইএফআইসি।

আমাদের কোথাও কোনো এজেন্ট নেই

১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫

IFICBankLimited www.ificbank.com.bd

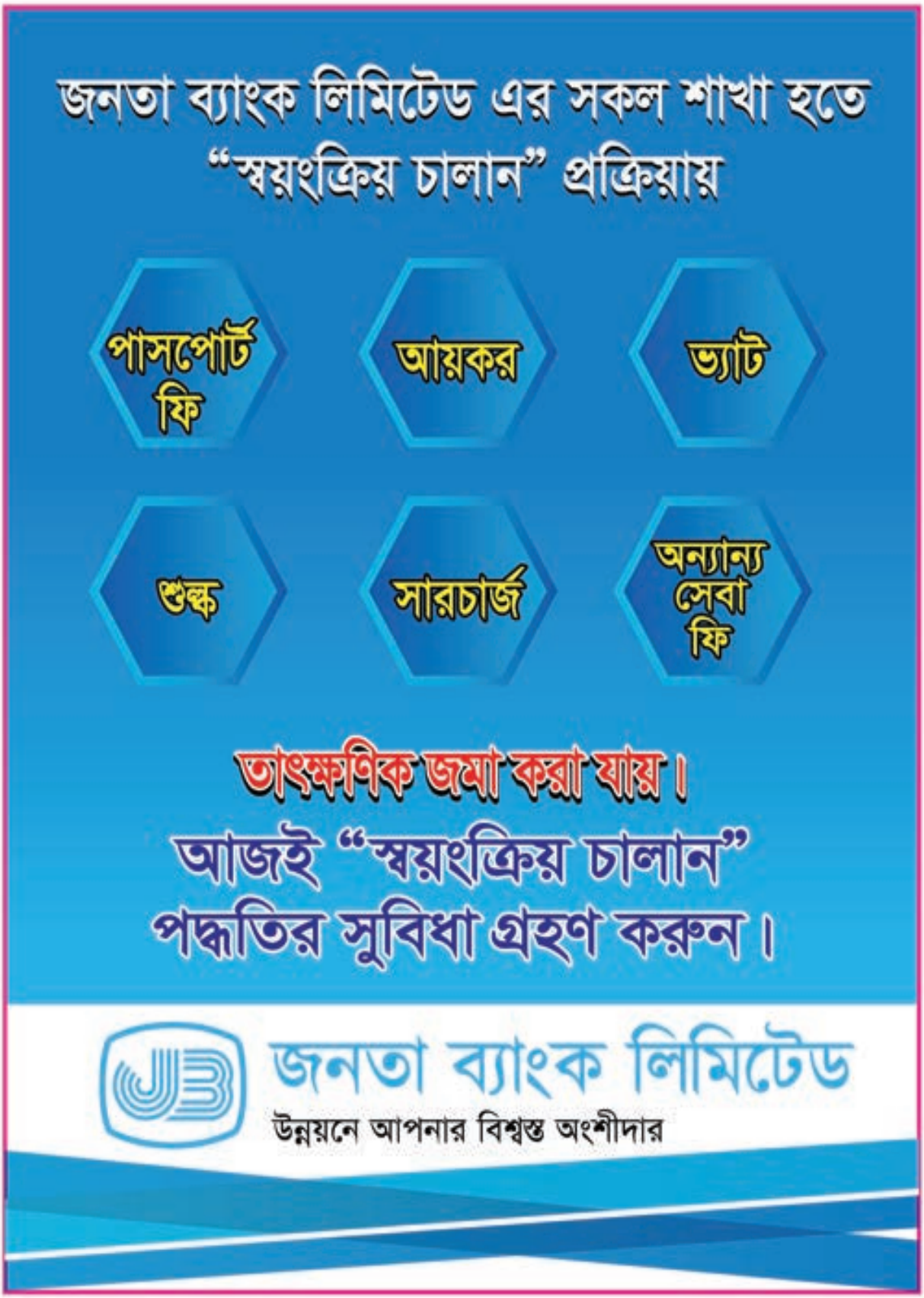

PRD/Display/2023/307-28/2/23

Bank Asia

HOME LOAN

MAKE YOUR
DREAM HOME A REALITY

- Loan amount upto 2 Crore
- Maximum 12 month grace period
- Faster Processing

Contact:
16205 (24/7) &
+8801719706663, +8801844490223

সরকারি কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা সমাধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী উদ্যোগ

সরকারি কর্মচারীদের বহুল প্রত্যাশিত আবাসন ঋণ এখন আপনার সুবিধামত রূপালী ব্যাংকের যে কোন শাখা হতে গ্রহণ করতে পারেন।

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং

ক্র.নং	বেতন গ্রেড / স্কেল	ঢাকা মহানগরী/ সকল সিটি কর্পোঃ/ বিভাগীয় সদর	জেলা সদর	অন্যান্য এলাকা
০১	৫ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব (৪৩,০০০/- ও তদূর্ধ্ব)	৭৫ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৫০ লক্ষ
০২	৯ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড (২২,০০০/- হতে ৩৫,৫০০/-)	৬৫ লক্ষ	৫৫ লক্ষ	৪৫ লক্ষ
০৩	১৩তম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেড (১১,০০০/- হতে ১৬,০০০/-)	৫৫ লক্ষ	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ
০৪	১৭তম গ্রেড হতে ১৪তম গ্রেড (৯,০০০/- হতে ১০,২০০/-)	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ	২৫ লক্ষ
০৫	২০তম গ্রেড হতে ১৮তম গ্রেড (৮,২৫০/- হতে ৮,৮০০/-)	৩৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ	২০ লক্ষ

*ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের জন্য ডেট ইকুইটি রেশিও হবে ৯০:১০

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
ই-৫ সি/১, পশ্চিম আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭।
ইমেইল: info@parjatan.gov.bd ওয়েবসাইট: www.parjatan.gov.bd
BangladeshParjatanCorporation